রামায়নের গল্প



আদিকান্ড

অনেকদিন আগে আমাদের এই ভারতবর্ষে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। সরযূ নদীর ধারে, অযোধ্যা নগরে তিনি রাজ্য করিতেন।

সেকালের অযোধ্যা নগর আটচল্লিশ ক্রোশ লম্বা, আর বার ক্রোশ চওড়া ছিল। তাহার চারিদিকে প্রকাণ্ড দেওয়ালের উপরে লোহার কাঁটা দেওয়া ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল সাজানো থাকিত। সে অস্ত্রের নাম শতঘ্নী, কেন না তাহা ছুঁড়িয়া মারিলে একেবারে এক শত লোক মারা পড়ে।

তখনকার অযোধ্যা দেখিতে খুব সুন্দরও ছিল। ছায়ায় ঢাকা পরিষ্কৃত পথ, ফুলে ভরা সুন্দর বাগান, আর দামী পাথরের সাততলা আটতলা জমকালো বাড়িতে নগরটি ঝলমল করিত।

এই সুন্দর অযোধ্যা নগরে শাদা পাথরের বিশাল রাজপুরীতে শাদা ছাতার নীচে বসিয়া মহারাজ দশরথ তাঁহার রাজ্যের কাজ দেখিতেন। ধৃষ্টি, বিজয়, অকোপ, জয়ন্ত, সুমন্ত্র, সুরাষ্ট্র, ধর্মপাল আর রাষ্ট্রবর্ধন নামে তাঁহার আটজন মন্ত্রী এমন বিদ্বান বুদ্ধিমান আর ধার্মিক ছিলেন যে, তাঁহার দেশে একটিও অন্যায় কাজ হইতে দিতেন না। সে দেশে চোর ডাকাত ছিল না। ভাল ছাড়া মন্দ কাজ কেহ করিত না। ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া, ভাল বাড়িতে থাকিয়া সকলেরই সুখে দিন যাইত। রাজা দশরথ তাহাদিগকে এত স্নেহ করিতেন যে আর কোন রাজা তেমন করিতে পারিতেন না। দশরথকেও তাহারা তেমনি করিয়া ভালবাসিত।

হায়! এমন রাজা দশরথ, তাঁহার একটিও ছেলে ছিল না। ছেলে নাই বলিয়া তিনি ভারি দুঃখ করিতেন। একদিন তিনি মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'দেখ, আমি যজ্ঞ করিব। হয়ত তাহাতে খুশি হইয়া দেবতারা আমাকে পুত্র দিবেন।'

এ কথা শুনিয়া সকলে, বলিল, 'মহারাজ, আপনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়া আসুন। তিনি যজ্ঞ করিলে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র হইবে।' এই মুনির হরিণের মত শিং ছিল, তাই লোকে তাঁহাকে ঋষ্যশৃঙ্গ বলিত। এমন ভাল মুনি কমই দেখা গিয়াছে।

মন্ত্রীদিগের কথা শুনিয়া দশরথ বলিলেন, 'বড় ভাল কথা। ঋষ্যশৃঙ্গ যে আমার জামাই হন, কারণ তিনি আমার বন্ধু লোমপাদ রাজার মেয়ে শান্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। আমি নিজেই তাঁহাকে আনিতে যাইব।'

লোমপাদ রাজার বাড়ি অঙ্গদেশে। দশরথ সেই অঙ্গদেশে গিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে লইয়া আসিলেন। তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

আগে হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ। ঘোড়ার মাংস দিয়া এই যজ্ঞ করিতে হয়। প্রথমে একটা ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘোড়ার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অনেক লোকজনও চলিল, যাহাতে কেহ তাহাকে আটকাইতে না পারে। তাহারা ক্রমাগত এক বৎসর ঘোড়াটাকে নানা দেশ ঘুরাইয়া শেষে তাহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিল।

তত দিনে শত-শত কারিকর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, মুটে মজুর মিলিয়া সরযূর উত্তর ধারে যজ্ঞের জন্য চমৎকার জায়গা তৈয়ার করিয়াছে। সেখানে কত মুনি, কত ব্রাহ্মণ, কত রাজা আর অন্য লোকজন কত আসিয়াছে, তাহার লেখাজোখা নাই। মিথিলার রাজা জনক, অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ, মগধের রাজা, পূর্বদেশের রাজা, সিন্ধুদেশের রাজা, সৌবীরের রাজা, সৌরাষ্ট্রের রাজা, আর কত বলিব! পৃথিবীর যত রাজার সঙ্গে দশরথের বন্ধুতা ছিল, সকলেই উপস্থিত।

ঘোড়া ফিরিয়া আসিলেই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যজ্ঞের কয়দিন সকলে কী আনন্দ করিয়া যে নিমন্ত্রণ খাইল, তাহা কী বলিব! যত চাহিয়াছে, ততই খাইতে পাইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মহারাজের জয় হউক!' ছেলেদের পেট ভরিয়া গেল, তবুও তাহারা বলিল, 'আরও খাইব।'

অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, 'এরপর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে মহারাজের ছেলে হইবে।'

তখনই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সেই যজ্ঞের আগুনের ভিতর হইতে একজন পুরষ বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাঁহার শরীর পাহাড়ের মত উঁচু, রঙ কালো, চোখ লাল, দাড়ি গোঁফ সিংহের কেশরের মত, পরণে লাল কাপড়। তাঁহার হাতে রূপার ঢাকা দেওয়া সোনার থালা, তাহাতে চমৎকার পায়স। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ দশরথকে বলিলেন, 'মহারাজ, ব্রহ্মা নিজে এই পায়স রাঁধিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা রানীদিগকে খাইতে দাও, নিশ্চয় তোমার পুত্র হইবে।' এই বলিয়া তিনি কোথায় যে মিলাইয়া গেলেন, কেহ দেখিতে পাইল না।

দশরথের কী আনন্দ! এই পায়স রানীদিগকে খাইতে দিলেই তাঁহার পুত্র হইবে! প্রধানা রানী তিন জন-বড় কৌশল্যা, মেজ কৈকেয়ী, ছোট সুমিত্রা। দশরথ কী করিয়া তিন জনকে পায়স বাঁটিয়া দিলেন, বলিতেছি। প্রথমেই সেই পায়সের অর্ধেকটা লইয়া খানিক সুমিত্রার জন্য আর বাকি কৌশল্যার জন্য রাখিলেন, তারপর অন্য অর্ধেকেরও খানিকটা সুমিত্রার জন্য, আর বাকিটা কৈকেয়ীর জন্য রাখা হইল। বেশ সহজ হিসাব।

তিন রানীতে মিলিয়া মনের সুখে এই পায়স খাইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের দেবতার মত চারিটি ছেলে হইল—কৌশল্যার একটি, কৈকেয়ীর একটি, আর সুমিত্রার দুইটি।

দশরথের পুত্র হইয়াছে শুনিয়া যে সকলেই আনন্দিত হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কী? ব্রাহ্মণ আর গরীব দুঃখীদের তো খুবই আনন্দ হইবার কথা, কারণ তাহারা অনেক টাকা-কড়ি পাইল।

ছেলে চারিটি এগারো দিনের হইলে পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাদের নাম রাখিলেন। সকলের বড় ছেলেটি কৌশল্যার, তাঁহার নাম হইল রাম। তাহার পরেরটি কৈকেয়ীর, তাঁহার নাম হইল ভরত। আর দুটি সুমিত্রার, তাঁহাদের নাম হইল লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন।

ছেলে চারটি যেমন সুন্দর, তেমনি বুদ্ধিমান, আর তেমনি তাঁদের মিষ্ট স্বভাব। ভাল ছেলের যতরকম গুণ থাকিতে হয়, তাহার কিছুই তাঁহাদের কম ছিল না। অল্পদিনের ভিতরেই তাঁহারা যার-পর-নাই বিদ্বান আর বীর হইয়া উঠিলেন। লেখায়, পড়ায়, যুদ্ধে, শিকারে কোন কাজেই তাঁহাদের মতন আর কেহ ছিল না।

ভাইকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্নকে দেখিলে বুঝিতে পারিতে। তাহার মধ্যে আবার রামকে লক্ষ্মণ আর

ভরতকে শত্রুঘ্ন আরও বেশি করিয়া ভালবাসিতেন। ইহাদিগকে দেখিলে সকলেই সুখী হইত। রাজা দশরথ যে কতখানি আনন্দিত হইতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

একদিন রাজা দশরথ পুরোহিত আর মন্ত্রীদিগকে লইয়া ছেলেদের বিবাহের পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র মুনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মুনিদের ভিতরে বিশ্বামিত্রের মান বড়ই বেশি। তাঁহার মত তপস্যা খুব কম লোকেই করিয়াছে, তেমন ক্ষমতাও খুব কম লোকেরই আছে। তাহাতে আবার লোকটি বিলক্ষণ একটু রাগী। এরূপ লোককে যেমন করিয়া আদর যত্ন করিতে হয়, দশরথ তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। তারপর তিনি বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনি যে আসিয়াছেন, ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্য; আর ইহাতে আমি খুবই সুখী হইলাম। এখন আপনি কী চাহেন বলুন, আমি তাহই দিতেছি।'

দশরথ ভাবিয়াছিলেন, মুনি টাকা-কড়ি চাহিবেন। কিন্তু মুনি যাহা চাহিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'মহারাজ, আমি যেজন্য আসিয়াছি তাহা শুন। আমি একটা যজ্ঞ করিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে মারীচ আর সুবাহু নামে দুই রাক্ষস আসিয়া তাহাতে মাংস ঢালিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি রাবণ নামে একটা ভয়ানক দুষ্ট রাক্ষস আছে, ইহারা তাহারই লোক। তুমি যদি দশ দিনের জন্য তোমার রামকে আমার সঙ্গে দাও, তবে সে রাক্ষস দুটাকে মারিয়া দিতে পারে। রাম ছাড়া আর কেহই এ কাজ করিতে পারিবে না। রাম এখন বড় হইয়াছে, আর বীরও যেমন-তেমন হয় নাই। রাক্ষসের সাধ্য কী যে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করে! তোমার কোন ভয় নাই। রামকে দিয়া আমার এ কাজটি করাইয়া দাও, ইহাতে ভাল হইবে।'

মুনির কথা শুনিয়াই তো দশরথ কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। খানিক পরে একটু সুস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনার পায়ে পড়ি, আমি রামকে দিতে পারিব না! আমার রাম কি এ-সকল ভয়ানক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে? না-হয় নিজেই অনেক লোকজন লইয়া আপনার যজ্ঞে পাহারা দিব। রামকে ছাড়িয়া দিন!' ইহাতে বিশ্বামিত্র এমনই রাগিয়া গেলেন যে, তাঁহার রাগ দেখিয়া দেবতারা পর্যন্ত অস্থির।

যে সর্বনেশে মুনি, ইহার আরও বেশি রাগ হইলে কি আর রক্ষা ছিল। কাজেই তখন বশিষ্ঠ মুনি রাজাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, শীঘ্র

রামকে আনিয়া দিন, ইহাতে রামের ভাল হইবে। বিশ্বামিত্র যেমন তেমন মুনি নহের, ইহার সঙ্গে যাইতে রামের কোনও ভয় নাই। তাহার ভালর জন্যই বিশ্বামিত্র তাহাকে লইতে আসিয়াছেন।' বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া দশরথের আর ভয় রহিল না। তিনি তখনই রাম আর লক্ষ্মণকে আনিয়া দিলেন।

যুদ্ধের পোশাক পরিয়া, তীর ধনুক খড়গ লইয়া, বিশ্বামিত্রের পিছু-পিছু দুই ভাইকে যাইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। রাজা আর রানীরা তাঁহাদের মাথায় চুমা খাইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; আর সকলেই বলিল, 'তোমাদের ভাল হউক!'

খানিক দূরে গিয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা রাম, ঐ সরযূর জলে মুখ ধুইয়া আইস। আমি তোমাকে "বলা" আর "অতি-বলা" নামক মন্ত্র দিব। এ মন্ত্র জানিলে তোমার পরিশ্রম বা অসুখ হইবে না, কেহ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, আর যুদ্ধে সকলেই তোমার কাছে হারিয়া যাইবে।' রাম নদীতে মুখ ধুইয়া মুনির নিকট মন্ত্র লইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার শরীরের তেজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

রাত্রি হইলে তিন জনে সরযূর ধারে ঘাসের উপর ঘুমাইয়া রহিলেন। সকালবেলা উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। সেদিনকার রাত্রি কাটিল অঙ্গদেশে মুনিদের আশ্রমে। এইখানে আসিয়া সরযূ নদী গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। পরদিন মুনিরা একখানি সুন্দর নৌকা আনিয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন।

ওপারে ভয়ানক বন। সেই বনে তাড়কা নামে একটা রাক্ষসী থাকে। তাহার গায়ে হাজার হাতির জোর। আগে এখানে সুন্দর দেশ ছিল, তাহাতে কতই লোকজন বাস করিত। এই তাড়কা আর তাহার পুত্র মারীচ সেই সকল লোকজনকে খাইয়া দেশটি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সেখানে ভয়ানক বন, সে বনে মানুষ গেলেই তাড়কা তাহাকে ধরিয়া খায়।

বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা, রাক্ষসীটাকে মারিতে হইবে।' রাম বলিলেন, 'আচ্ছা।' এই বলিয়া তিনি ধনুকের গুণ ধরিয়া খুব জোরে টঙ্কার দিলেন। ধুনকের গুণ জোরে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে 'টং' করিয়া একটা শব্দ হয়, তাহাকেই বলে 'টঙ্কার'। রাম ধনুকে এমনি টঙ্কার দিলেন যে, তাহা শুনিয়া বনের জন্তুরা মনে করিল বুঝি সর্বনাশ উপস্থিত।

সে শব্দে তাড়কাও প্রথমে চমকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই সে হাত তুলিয়া, হাঁ করিয়া, ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন ধুলায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া সে রাম-লক্ষ্মণের উপরে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল।

কিন্তু রামের বাণের কাছে সে পাথর কিছুই নয়। তিনি পাথর তো আটকাইলেনই, তাহার উপর আবার রাক্ষসীর লম্বা হাতদুটোও কাটিয়া ফেলিলেন। তবুও কিন্তু সে ছুটিয়া আসিতে ছাড়ে না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাহার নাক আর কান কাটিয়া দিলেন। তখন সে হঠাৎ কোথায় যে মিলাইয়া গেল, কিছুই বুঝা গেল না। হাত নাই তবুও বড় বড় পাথর ছুড়িয়া মারে, কিন্তু কোথায় আছে দেখা যাইতেছে না।

তখন রাম কেবল তাহার শব্দ শুনিয়াই সেই শব্দের দিকে তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন। এমন ভয়ানক তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন যে, রাক্ষসী তাহার জীবনে আর কখনও এত তীর খায় নাই। লুকাইয়া থাকিবার জো কী! তীরের জ্বালায় অস্থির হইয়া শেষটা তাহাকে দেখা দিতেই হইল। আর রামও অমনি এক বাণে একেবারে তাহার বুক ফুটা করিয়া দিলেন। তখন ভয়ানক চিৎকার করিয়া তাড়কা মরিয়া গেল।

দেবতারা আকাশ হইতে রামের যুদ্ধ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আর বিশ্বামিত্রের তো কথাই নাই। তিনি রামকে কি বলিয়া আশীর্বাদ করিবেন, আর কী দিয়া সুখী করিবেন, তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সে রাত্রি তাঁহাদের সেই বনেই কাটিল। সকালে উঠিয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাই তোমাকে কতকগুলি আশ্চর্য অস্ত্র দিব। এ-সকল অস্ত্র থাকিলে কেহই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে না।'

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র পূর্বমুখে বসিয়া মনে মনে অস্ত্রদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, আর অমনি নানারূপ আশ্চর্য এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, ব্রহ্মশির, ঐষিক, ব্রহ্মাস্ত্র, ধর্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, শুষ্ক অশনি, আর্দ্র অশনি, পৈনাক, নারায়ণ, শিখর, বায়ব্য, হয়শির, ক্রৌঞ্চ, কঙ্কাল, মুষল, কপাল, কিঙ্কিণী, নন্দন, মোহন, প্রস্বাপন, প্রশমন, বর্ষণ, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, মাদন, মানব, তামস, সৌমন, সংবর্ত—আর কত নাম করিব! এ-সকল ছাড়া আরও অনেকগুলি অস্ত্র, শক্তি, খ, গদা, শূল, বজ্র ইত্যাদি বিশ্বামিত্রের ডাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা জোড়হাত করিয়া রামকে বলিল, 'রাম, আমরা এখন তোমার হইয়াছি; তুমি যাহাই বলিবে তাহাই করিব।' রাম একে একে তাহাদের সকলের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন,'এখন যাও, আমি যখন ডাকিব, তখন আসিবে।' অস্ত্রেরা 'আচ্ছা তাহাই হইবে' বলিয়া যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেইখানে চলিয়া গেল।

ইহার পর তাঁহারা একটা খুব সুন্দর স্থানে আসিলেন। সে স্থানটি দেখিয়া রাম বলিলেন, 'কী সুন্দর জায়গা! গুরুদেব, এখানে কে থাকেন?' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'এই স্থানের নাম সিদ্ধাশ্রম। এখানে আগে কশ্যপ মুনি থাকিতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী অদিতি দেবীর সহিত এক হাজার বৎসর এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া। বিষ্ণু নিজে তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মেন। সেই ছেলের নাম বামন। তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। এখন আমি এই স্থানে থাকিয়া তপস্যা করি। এইখানে দুষ্ট রাক্ষসেরা যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসে। সেই দুষ্টদিগকে তুমি মারিবে।'

এই কথা বলিতে না বলিতেই তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর ঠিক হইল যে, পরদিন যজ্ঞ আরম্ভ হইবে।

যজ্ঞের দিন ভোরে উঠিয়া রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, রাক্ষসেরা কখন আসিবে ঠিক করিয়া বলিয়া দিন।' বিশ্বামিত্র তখন চক্ষু বুজিয়া বসিয়া ছিলেন, রাম লক্ষ্মণের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। অন্য মুনিরা বলিলেন, 'রাজপুত্র, উনি মৌনে বসিয়া আছেন। উঁহাকে ছয় রাত্রি ঐরূপ চুপ করিয়া থাকিতে হইবে, কথা বলিতে পারিবেন না। এই ছয় রাত্রি তোমরা খুব সাবধান হইয়া তপোবন পাহারা দাও।' রাম লক্ষ্মণ তখনই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন। দিন নাই, রাত নাই, চোখে ঘুম নাই, খালি কখন রাক্ষস আসে সেদিকেই তাঁহাদের মন।

এইরূপে পাঁচ দিন চলিয়া গেল। ছয় দিনের দিন তাঁহারা আরও বেশি করিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। এমন সময় দপ্ করিয়া যজ্ঞের বেদী জ্বলিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ভয়ানক শব্দ, আর যজ্ঞের জায়গায় রক্ত বৃষ্টি। তখন রাম উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, মারীচ আর সুবাহুর সঙ্গে বড় বড় বিকটাকার রাক্ষসেরা দল বাঁধিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিয়াছে।

তাহা দেখিয়া রাম মারীচের বুকে মানবাস্ত্র নামক বাণ ছুঁড়িয়া মারিলেন। বাণের চোটে সে বেচারা অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে একশত যোজন দূরে সমুদ্রে গিয়া পড়িল। তারপর রাম আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁড়িলে তাহার ঘা

খাইয়া সুবাহু সেইখানেই পড়িয়া মরিল। বাকি রাক্ষসগুলিকে মারিতে খালি বায়ব্য অস্ত্র ছাড়া আর কিছুর দরকার লাগে নাই। তখন মুনিগণের যে কি আনন্দ হইল, তাহা কি বলিব!

অনেক পরিশ্রমের পর সে রাত্রিতে লতা-পাতার বিছানায় রাম লক্ষ্মণ বড়ই সুখে ঘুমাইলেন। পরদিন সকালে মুনিরা বলিলেন, 'চল বাবা, মিথিলায় যাই। সেখানকার রাজা জনক যজ্ঞ করিবেন, তাহা দেখিতে হইবে। আর সেখানে একখানা ভয়ঙ্কর ধনুক আছে, তাহাতে এত জোর যে, দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, মানুষ কেহই তাহাতে গুণ দিতে পারে নাই। সেই ধনুকখানাও দেখিতে হইবে।' এই বলিয়া মুনিরা মিথিলায় যাইবার জন্য জিনিসপত্র বাঁধিয়া লইলেন। জিনিস নিতান্ত কম ছিল না, একশতখানা গাড়ি তাহাতেই বোঝাই হইয়া গেল।

সবুজ শস্যের ক্ষেতের মধ্য দিয়া তাঁহাদের চলিবার পথ। সে পথে যাইতে রাম লক্ষ্মণের বড়ই ভাল লাগিতেছিল। সেদিনকার রাত্রিতে তাঁহারা শোন নদের ধারে আসিয়া রহিলেন। তাহার পরের রাত্রি গঙ্গার ধারে, তাহার পরের রাত্রি বিশালা নগরে কাটিল। চারি দিনের দিন সকালবেলায় তাঁহারা দূর হইতে মিথিলার সুন্দর রাজপুরী দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থানের নিকটেই একটি অতি সুন্দর আর খুব পুরাতন আশ্রম ছিল। তাহা দেখিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরুদেব, এটি কাহার তপোবন? এখানে কেন লোকজন নাই?'

বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'বাছা, এটি গৌতম মুনির আশ্রম। গৌতমের স্ত্রী অহল্যা একবার একটা নিতান্ত অপরাধের কাজ করাতে গৌতম তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন, "তুই এইখানে ছাইয়ের উপর পড়িয়া থাক। তোকে কেহ দেখিতে পাইবে না। বাতাস ভিন্ন তুই আর কিছু খাইতে পাইবি না। এইরূপে তোর অনেক বৎসর কাটিবে। তারপর যখন দশরথের পুত্র রাম এইখানে আসিবেন, তখন তাঁহার পূজা করিস। তাহা হইলে আবার তুই ভাল হইবি, আর আমিও ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া গৌতম কৈলাস পর্বতে চলিয়া গেলেন। রাম, তুমি একবার এই আশ্রমের ভিতরে আইস। তাহা হইলে অহল্যা আবার ভাল হইতে পারেন।'

গৌতমের আশ্রমে গিয়া তাঁহারা অহল্যা দেবীকে দেখিতে পাইলেন। এতদিন ধরিয়া তিনি কেবলই তপস্যা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার শরীরে এমন আশ্চর্য তেজ হইয়াছে যে, দেবতারাও তাঁহার দিকে তাকাইতে পারেন না। এতদিন গৌতমের শাপে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এখন রাম আসিয়াছেন বলিয়া

সকলেই তাঁহাকে দেখিল। অহল্যাকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় করিয়া লইলেন। অহল্যাও গৌতমের কথা মনে করিয়া রামকে পূজা করিলেন। এদিকে গৌতম মুনি হিমালয়ে থাকিয়া তপস্যার দ্বারা সকল কথাই জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তিনিও তখন সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। এইরূপে অহ্যার দুঃখের শেষ হইল। তারপর গৌতম আর অহল্যা দুইজনে মিলিয়া মনের সুখে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

গৌতমের আশ্রম হইতে মিথিলা বেশি দূরে নয়। সেখানে গিয়া সকলে দেখিলেন যে, জনক রাজা অতি চমৎকার যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। কত মুনি, কত লোকজন, কত গাড়ি ঘোড়া সেখানে আসিয়াছে, তাহা গণিয়া উঠা ভার। বিশ্বামিত্র তাঁহাদের থাকিবার জন্য সেই ভিড়ের এক কোণে একটি নিরিবিলি জায়গা খুঁজিয়া লইলেন। ততক্ষণে রাজা জনকও খবর পাইয়া বিশ্বামিত্রকে আদর করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার পুরোহিত শতানন্দ মুনি।

বিশ্বামিত্রকে নানারূপ সম্মানে তুষ্ট করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনার সঙ্গের এই ছেলে দুটি কী সুন্দর! আহা, যেন দুটি দেবতার ছেলে! এ দুটি কোন্ রাজার পুত্র? আর কি জন্য এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছেন?' বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'মহারাজ, ইহারা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। সিদ্ধাশ্রমে রাক্ষসদিগকে মারিয়া, তারপর গৌতমের আশ্রমে অহল্যার কষ্ট দূর করিয়া এখানে আসিয়াছেন। এখন ইহাদের সেই শিবের ধনুক দেখিবার ইচ্ছা।'

জনকের পুরোহিত শতানন্দ মুনি গৌতমের বড় ছেলে। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার মাতা আবার ভাল হইয়াছেন, তখন তাঁহার মনে কী সুখই হইল! তিনি রামকে কতই স্নেহ দেখাইলেন আর বিশ্বামিত্রের কত প্রশংসা করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্রই রামকে আনিয়া তাঁহার মায়ের দুঃখ দূর করিয়াছেন।

পরদিন সকালবেলায় বিশ্বামিত্র জনককে বলিলেন, 'মহারাজ, সেই ধনুকখানি রাম লক্ষ্মণ একবার দেখিতে চাহেন।'

জনক বলিলেন, 'ধনুকের কথা বলি শুনুন। এই ধনুক আগে ছিল শিবের। শিব একবার দেবতাদের উপর চটিয়া গিয়া এই ধনুক হাতে তাঁহাদিগকে তাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতারা অনেক মিনতি করাতে খুশি হইয়া ধনুকখানা তাঁহাদিগকেই দিলেন। দেবতারা আবার রাজা দেবরাতের নিকট তাহা রাখেন। এই দেবরাত আমার পূর্বপুরুষ।

ইহার পর একদিন আমি লাঙল দিয়া যজ্ঞের স্থান চষিতেছিলাম। এমন সময় আমার লাঙলের মুখের কাছে পৃথিবী হইতে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা উঠিল। সেই মেয়েটি এতদিনে আমার ঘরে থাকিয়া এখন বড় হইয়াছে। লাঙলের মুখে উঠিয়াছিল বলিয়া আমি তাহার নাম রাখিয়াছি সীতা। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, এই শিবের ধনুকে যে গুণ দিতে পারিবে তাহাকেই এই মেয়ে দিব।

'তারপর কত রাজা আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা ধনুকে গুণ দিবে কি, তাহা তুলিতেই পারে না। তখন তাহারা ভয়ানক চটিয়া গিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। আমি অনেক কষ্টে, দেবতাদের সাহায্য লইয়া শেষে শত্রুদিগকে তাড়াই। এখন সেই ধনুক আমি রাম লক্ষ্মণকে দেখাইব। রাম যদি তাহাতে গুণ দিতে পারেন, তবে তিনি সীতাকে পাইবেন।'

তখন জনকের হুকুমে ধনুকখানা বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আনা হইল। আট চাকার গাড়ির উপরে, লোহার সিন্ধুকের মধ্যে ধনুকখানি রহিয়াছে। তাহা টানিয়া আনিতে পাঁচ হাজার জোয়ান কাহিল! রাম সেই ধনুক দেখিয়া কহিলেন, 'এটাতে গুণ দিতে হইবে নাকি?' বিশ্বামিত্র আর জনক বলিলেন, 'হাঁ।'

এত বড় ধনুক তুলিতে রামের একটু কষ্ট হইলেও তাঁহার নিন্দার কথা ছিল না। কিন্তু কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং সে কাজটা তাঁহার খুব সহজই বোধ হইল। যেই ধনুক তোলা, অমনি তাহাতে গুণ চড়ানো। তারপর গুণ ধরিয়া এক টান দিতেই, ধনুক ভাঙিয়া একেবারে দুইখান! এমনি সহজে রাম সেই ধনুক ভাঙিলেন।

কিন্তু রাম তাহা সহজে ভাঙিলেন বলিয়া তো ধনুকখানি সহজ ধনুক ছিল না! আর সে ধনুক ভাঙার ব্যাপারখানাও যেমন তেমন ব্যাপার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তাহার শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক আর রাম লক্ষ্মণ ছাড়া সকল লোক চিৎপাত হইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তখন জনক বলিলেন, 'রামের গায়ে আশ্চর্য জোর! এমন আর কাহারও নাই। আমি ইহার সঙ্গেই সীতার বিবাহ দিব।'

তখনই পত্র লইয়া দূতেরা দশরথকে আনিতে অযোধ্যায় চলিল। দশরথও তাহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। পরদিনই বশিষ্ঠ আর অন্য-অন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি মিথিলা যাত্রা করিলেন।। ধন-রত্ন, গাড়ি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত, কত সঙ্গে লইলেন, তাহার লেখাজোখা নাই। মিথিলায় পৌঁছিতে তাঁহাদের চারিদিন লাগিল।

রাজায় রাজায় দেখা হইলে একটা খুবই ধূমধাম হইয়া থাকে। সে আর কত বর্ণনা করিব? কিন্তু আসল কাজের কথাটা, রামের বিবাহের কথা। সে বিষয়ের পরামর্শ কিরূপ হইয়াছিল, বলিতেছি।

জনক রাজার আর একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম উর্মিলা। তাহা ছাড়া জনকের ভাই রাজা কুশধ্বজের দুটি মেয়ে ছিল, তাহাদের নাম মান্ডবী আর শ্রুতকীর্তি। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারিটি ভাইয়ের সঙ্গে সীতা, উর্মিলা, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি এই চারিটি বোনের বিবাহ হইলে বেশ ভাল হয়, না? সুতরাং স্থির হইল যে, রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্মিলার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর, আর শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্তির বিবাহ হইবে।

সুন্দর সময়ে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মহা ধূমধামে শুভকার্য শেষ হইলে সেদিন মিথিলায় কী আনন্দই হইয়াছিল! যেদিকে তাকাও কেবলই আলো, আর ধূপ-ধূনা, আর মুনিঠাকুর, আর শঙ্খ-ঘন্টা, আর ঢাক-ঢোল; আর হাতি ঘোড়া, আর মিঠাই সন্দেশ, আর ভিখারী বৈষ্ণব, আর হাসি তামাশা, ছুটাছুটি, ভোজন, ভোজন, কোলাহল, কোলাহল, কোলাহল।

পরদিন সকালে বিশ্বামিত্র হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। দশরথও অযোধ্যায় যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জনক প্রত্যেক মেয়েকে কী দিয়াছিলেন শুনিবে? প্রত্যেক মেয়েকে তিনি এক-এক লক্ষ গরু দিয়াছিলেন। আর হাতি, ঘোড়া, সিপাহি, রূপা, মণি, মুক্তা, রেশমী কাপড়, কম্বল ইত্যাদি কত যে দিয়াছিলেন, আমি তাহার হিসাব দিতে পারিব না। ইহার উপর আবার এক এক শত করিয়া সখী, এক-এক শত দাসী, আর এক-এক শত চাকর। এইরূপ আদর যত্ন করিয়া জনক সকলকে বিদায় করিলেন। দশরথও মনের সুখে অযোধ্যায় চলিলেন।

এমন সময় দেখ কী সর্বনাশ উপস্থিত! পাখিরা চ্যাঁচাইতেছে, জন্তুরা ছুটিয়া পলাইতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, ঝড় বহিতেছে, গাছ ভাঙিয়া পড়িতেছে, সূর্য ঢাকিয়া গিয়াছে, চারিদিক অন্ধকার। সকলে ভয়ে অস্থির, না জানি এর পর কী বিপদ হইবে!

বিপদ যে কি, তাহা জানিতেও বিলম্ব হইল না; কারণ তখনই পরশুরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে মানুষ পথ দিয়া চলিবার সময় এমন কাণ্ড হয়, তিনি যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক, তাহা বুঝিতেই পার। তাঁহার শরীরটা যেন একটা পাহাড়, চোখদুটো যেন আগুনের গোলা! হাতে একখানি ধনুক আছে

তাহা সেই জনক রাজার ধনুকের চেয়ে নিতান্ত কম নহে। আর একখানা কুড়াল যে আছে, তাহার কথা কি বলিব! কুড়াল কাঁধে ফিরেন বলিয়া তাঁহার 'পরশু' অর্থাৎ 'কুড় লে' রাম নাম হইয়াছে (পরশু অর্থে কুড়াল)। এই কুড়াল দিয়া তিনি একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমাগত একুশবার ক্ষত্রিয়দিগকে কাটিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়াছেন। তাহাদের অপরাধ এই যে, কার্তবীর্যার্জুন নামক তাহাদের একজন তাঁহার বাপ জমদগ্নি মুনিকে মারিয়া ফেলে।

এতদিনে তাঁহার রাগটা একটু কমিয়া গিয়াছে। এখন আর ক্ষত্রিয় দেখিলেই তাহাকেই ধরিয়া মারেন না। কিন্তু রামের উপর তিনি বড়ই চটিয়া গিয়াছেন। তিনি আসিয়া রামকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন, 'তুমি নাকি বড় বীর হইয়াছ? শিবের ধনুক ভাঙিয়াছ? বটে! আচ্ছা, আমি এই আর একখানি ধনুক আনিয়াছি। এখানিতে একবার তীর চড়াইয়া টান দেখি! যদি পার, তবে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।'

ইহা শুনিয়া দশরথের বড় ভয় হইল। তিনি মনে করিলেন, না জানি এই সর্বনেশে মানুষ রামের কী ভয়ানক অনিষ্টই করিবেন! তাই তিনি রামকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পরশুরামকে অনেক মিনতি করিলেন। কিন্তু পরশুরাম কি তাহা শোনেন! তিনি রামকে বলিলেন, 'বিশ্বকর্মা দু-খানি বড় ধনুক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার একখানি তুমি ভাঙিয়াছ, আর এককানি এই আমার হাতে আছে। এখানি সেখানার চেয়ে কম নয়। এখন বলিতেছি, আমার এই ধনুকখানিতে তীর চড়াও, দেখি কেমন ক্ষত্রিয়!'

ক্ষত্রিয়কে 'দেখি তুমি কেমন ক্ষত্রিয়' বলিলে বড়ই অপমানের কথা হয়। সে তাহা কিছুতেই সহিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তখন রাম বলিলেন, 'আচ্ছা তবে দেখুন'। এই বলিয়া তিনি ধনুকখানি লইয়া তাহাতে গুণ দিলেন। তারপর একটি বাণ তাহাতে চড়াইয়া বলিয়া তিনি ধনুকখানি লইয়া তাহাতে গুণ দিলেন। তারপর একটি বাণ তাহাতে চড়াইয়া বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার গুরুলোক; তাই এই বাণ আমি আপনার উপর ছুঁড়িতে ইচ্ছা করি না; কেন না, তাহা হইলে আপনি মরিয়া যাইবেন। তবে আপনি তপস্যা করিয়া যে সকল জায়গা পাইয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিলে তাহা নষ্ট করিয়া দিতে পারি, না হয় আপনার আকাশে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারি। এখন বলুন, ইহার কোন্‌টা করিব?'

এতক্ষণে পরশুরামের সে রাগ নাই। তিনি খুবই জব্দ হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি নরম হইয়া বলিলেন, 'রাম, আমার তপস্যায় পাওয়া স্থানগুলিই না হয় নষ্ট করিয়া দাও, কিন্তু আমার পথ আটকাইওনা। তোমার ভাল হউক। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি যে-সে লোক নহ।' সুতরাং রাম তীর ছুঁড়িয়া পরশুরামের তপস্যায় পাওয়া জায়গাগুলি নষ্ট করিয়া দিলেন, তাঁহার পথ আটকাইলেন না। তখন পরশুরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, আর আর সকলে অযোধ্যায় চলিয়া আসিল।

তারপর রানীরা কত আদর করিয়া বউ লইলেন, সে আর বেশি করিয়া কি বলিব? সে সময় পূজা অর্চনা, গান বাজনা, আমোদ আহ্লাদ অবশ্যই হইয়াছিল। রানীরা বউদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বসন ভূষণ কত কী দিয়াছিলেন, সে খবর কে রাখে!

আমি কেমন ইহাই জানি যে, ইহার কিছুদিন পরে ভরত আর শত্রুঘ্ন মামার বাড়ি বেড়াইতে গেলেন।

অযোধ্যা কাণ্ড

রাজা দশরথের বয়স প্রায় ষাট হাজার বৎসর হইয়াছে। এত বয়স হইলে কতখানি বুড়া হয় বুঝিতেই পার। কাজেই তিনি এখন আর রাজ্যের কাজের জন্য আগের মতন পরিশ্রম করিতে পারেন না। আর রামও এতদিনে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জোরে, সাহসে,-যত রকম গুণ হইতে পারে, সকল গুণেই সকলের বড় হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা দেখিয়া দশরথ একদিন মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'আমি এখন বুড়া হইয়াছি, আর কত দিনই বা বাঁচিব। তাই আমি মনে করিতেছি যে রামকে যুবরাজ করিয়া দেই।' এই বলিয়া তিনি মন্ত্রী পাঠাইয়া দেশ বিদেশে সংবাদ দিলেন, 'আমি একটা মস্ত সভা করিব।'

খবর পাইয়া পৃথিবীর যত ভাল ভাল রাজা আর বড় লোক সকলে দশরথের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সভায় দশরথ বলিলেন, 'দেখ, এতদিন আমি যতদূর পারিয়াছি রাজ্যের কাজ করিয়াছি। এখন আমার অনেক বয়স হইয়াছে, চুল পাকিয়া গিয়াছে, গায়ের জোর কমিয়া গিয়াছে। এই বুড়া বয়সে আমি রাজ্যের জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারি না। আমার রাম এখন বড় হইয়াছেন, আর তাঁহার গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। এজন্য আমি এখন তাঁহার হাতে রাজ্যের ভার দিতে চাহিতেছি। তাহাতে তোমরা কী বল?'

এ কথায় সকলে বলিল, 'মহারাজ, রামের গুণের কথা কী বলিব! পৃথিবীতে এমন আর নাই! দেশের লোক রামকে যে কত ভালবাসে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনি রামকে যুবরাজ করিয়া দিন, দেখিয়া আমাদের চক্ষু জুড়াক।'

তখন দশরথ বলিলেন, 'সুন্দর চৈত্র মাস আসিতেছে; বনে ফুল ফুটিয়াছে। আপনারা শীঘ্র আয়োজন করুন। এই সুন্দর সময়ে রামকে যুবরাজ করিতে হইবে।' এই কথা শুনিয়া সভার লোক এতই আনন্দিত হইল যে, তাহাদের কোলাহলে সভাঘর ফাটে আর কি!

দশরথের কথায় মন্ত্রী সুমন্ত্র তখনি রামকে লইয়া আসিলেন। দশরথ পরম আদরের সহিত তাঁহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমার যেমন গুণ, সকলে তোমাকে তেমনি ভালবাসে। এখন তুমি যুবরাজ হও, তাহা দেখিয়া সকলে সুখী হউক।' রামের যাহারা বন্ধু, তাহারা শুনিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া কৌশল্যাকে খবর দিল। সে সংবাদে কৌশল্যা কিরূপ খুশি হইয়াছিলেন, আর তাহাদিগকে কত পুরস্কার দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতেই পার।

স্থির হইল যে, পরদিনই রামকে যুবরাজ করা হইবে। সে সংবাদে অযোধ্যায় হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। অযোধ্যার লোকেরা মনের আনন্দে আর ঘরের ভিতরে না থাকিতে পারিয়া পথে আসিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। গাড়ি ঘোড়া লইয়া আর চলিবার জো রহিল না। সকলের মুখে খালি রামের কথা! কেহ বলিতেছে 'বাঃ, মহারাজ কী ভাল কাজই করিলেন"' কেহ বলিতেছে, 'মহারাজ চিরজীবী হউন!'

রানী কৈকেয়ীর একটা দাসী ছিল। তাহার নাম ছিল মন্থরা; কিন্তু তাহার পিঠে একটা মস্ত কুঁজ ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে কুঁজী বলিয়া ডাকিত। যেমন কদাকার চেহারা, তেমনি তাহার কুটিল মন ছিল। উহার ঐ মস্ত কুঁজটার ভিতরে বুঝি খালি হিংসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কৈকেয়ী ঐ দাসীটিকে বাপের বাড়ি হইতে আনিয়াছিলেন, কাজেই তাহাকে বড় আদর করিতেন।

সকালবেলা লোকের কলরব শুনিয়া কুঁজী ছাতে উঠিয়া দেখিতে গেল, কিসের গোলমাল! সেখানে গিয়া দেখিল যে, রাস্তায় চন্দনের জল আর পদ্মের পাপড়ি ছড়ানো হইয়াছে, নিশান উড়িতেছে, আর চারিদিকে কেবল গান বাজনা আর কোলাহল শুনা যায়। ইহাতে কুঁজীর মনে বড়ই ভাবনা উপস্থিত হইল। উহার কাছেই একটি ঝি রেশমী কাপড় পরিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। কুঁজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গো, রামের মা কৌশল্যা কিসের জন্য লোককে এত টাকা দিতেছে? ও যে কৃপণ, তবুও এমন করিয়া টাকা দিতেছে, ব্যাপারখানা কী?' ঝি বলিল, 'কাল যে রাম যুবরাজ হইবেন!'

এই কথা শুনিয়া আর কি কুঁজী হিংসায় স্থির থাকিতে পারে? সে হিংসায় যে তার কুঁজ তখন ফাটিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য। ফাটিলে ভালই ছিল। কৈকেয়ী তখন শুইয়া ছিলেন। কুঁজী সেখানে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাড়া-কি তাড়া! 'বড় যে শুইয়া আছ? দেখিতেছ না যে তোমার সর্বনাশ হইয়া গেল? শীঘ্র উঠ!'

কুঁজীর রাগ দেখিয়া কৈকেয়ী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'কী হইয়াছে, মন্থরা? আমার কোন বিপদ হইয়াছে কি? তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?' মন্থরা দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, 'তোমার যাহাতে সর্বনাশ হয়, তাহাই হইয়াছে! কাল মহারাজ রামকে যুবরাজ করিবেন!'

এ কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর এত আনন্দ হইল যে তিনি তখনই একখানা দামী গহনা কুঁজীকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন। কুঁজী তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'কী বোকা! এমন বিপদে পড়িয়া আবার আমোদ করিতেছে! রাম রাজা হইলে ভরতের সর্বনাশ হইবে না বুঝি? আর তুমিও বুঝি তখন কৌশল্যা রানীর দাসী হইয়া থাকিবে না?

কৈকেয়ী বলিলেন, 'মন্থরা, রাম বড়ই ধার্মিক। আর তিনি যখন বড় ছেলে, তখন তাঁহারই তো রাজ্য পাওয়া উচিত। রাম আমাকে যেমন যত্ন করেন, ভরতও তেমন করে না। আমি ভরতকে যেমন ভালবাসি, রামকেও তেমনি ভালবাসি। রাম রাজা হইলে দেখিবে, তিনি ভাইদিগকে কত সুখে রাখিবেন।'

কুঁজী লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল; হায় হায়, এ কেমন মেয়ে গো! আমি তোমার ভালোর জন্য এত করি, আর তুমি আমার কথায় কানই দাও না! রাম রাজা হইলে নিশ্চয় ভরতকে তাড়াইয়া দিবে, না হয় মারিয়া ফেলিবে। আর সেই রামের যে মা, কৌশল্যা রানী, তাহাকে তো এতদিন তুমি অগ্রাহ্যই করিয়াছ। সে কি তখন তাহার শোধ লইতে ছাড়িবে? তাই বলি, এইবেলা যাহাতে ভরত রাজ্য পায় আর রাম বনে চলিয়া যায়, তাহার উপায় দেখ।'

হায় হায়, কুঁজী হতভাগী কেন পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল! কৈকেয়ীর মন তো আগে মন্দ ছিল না! দুষ্ট কুঁজীই তো তাঁহার ভিতর হিংসা ঢুকাইয়া দিল। কুঁজী যখন 'ভরতকে রাম মারিয়া ফেলিবে' বলিয়া ভয় দেখাইল, তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 'মন্থরা, আজই আমি রামকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে রাজা করিব। এখন এই কাজটি কেমন করিয়া হইতে পারে বল।'

কুঁজী বলিল, 'সেকি! তুমি কি সব ভুলিয়া গিয়াছ? সেই যে দণ্ডকবনের ভিতরে বৈজয়ন্ত নগরে সম্বর অসুর ছিল, দেবতাদের সঙ্গে তাহার ভয়ানক যুদ্ধ

হয়। সেই যুদ্ধে আমাদের রাজা দেবতাদের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তোমাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। রাজা ভয়ানক অস্ত্রের ঘা খাইয়া যুদ্ধের জায়গাতেই অজ্ঞান হইয়া গেলেন, তখন তুমিই তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া আসিয়া বাঁচাইলে। তাহাতে তিনি তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিলেন। তুমি বলিলে, "যখন ইচ্ছা হয় লইব"। এ-সকল কথা তো তোমার মুখেই শুনিয়াছি। এখন কেন সেই বর চাহিয়া লও না? এক বরে রামকে বনে পাঠাও, আর এক বরে ভরতকে রাজা কর। তাহা হইলেই আপদ চুকিয়া যাইবে। এক কাজ কর। তুমি ময়লা কাপড় পরিয়া, মুখ ভার করিয়া, মেঝেতেই পড়িয়া থাক। রাজা আসিলে কথাটিও কহিবে না, খালি রাগ করিবে আর কাঁদিবে। রাজা তোমাকে যে ভালবাসেন! তোমার রাগ দেখিলে নিশ্চয় তিনি ভয় পাইবেন, আর যাহা চাও তাহাই দিয়া তোমাকে খুশি করিবেন। কিন্তু খবরদার! আগে রাজার মুখ দিয়া এই কথাটি বাহির করিয়া লইবে যে, তুমি যাহা চাও তাহাই তিনি দিবেন। এইরকম করিয়া তাঁহাই দিয়া তোমাকে খুশি করিবেন। কিন্তু খবরদার! আগে রাজার মুখ দিয়া এই কথাটি বাহির করিয়া লইবে যে, তুমি যাহা চাও তাহাই তিনি দিবেন। এই রকম করিয়া তাঁহাকে কথায় আটকাইয়া তারপর বর দুইটি চাহিবে। তাহা হইলে আর তাঁহার "না" বলিবার জো থাকিবে না।'

এইরূপ করিয়া কুঁজী কৈকেয়ীর মন একেবারে খারাপ করিয়া দিল। তখন তাঁহার মুখে কুঁজীর প্রশংসা আর ধরে না! এরপর ময়লা কাপড় পরিয়া, গহনা ভাঙিয়া কেবলই কাঁদিতেছেন। কী সর্বনাশ! কৈকেয়ীর কী হইয়াছে? কে তাঁহার এমন দশা করিল? বেচারা বুড়া রাজা ব্যস্ত হইয়া এইরূপ কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে, কৈকেয়ীর কী হইয়াছে! রাজা কত মিষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈকেয়ী, তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে? না কেহ তোমাকে কিছু বলিয়াছে? না তুমি কাহারও উপর রাগ করিয়াছ?' কৈকেয়ী কোন কথারই উত্তর দিলেন না।

শেষে রাজা বলিলেন, 'তোমার কি কিছু চাই? বল সেটা কোন্ জিনিস, এখনই তাহা দিতেছি।' তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 'আগে প্রতিজ্ঞা কর দিবে, তবে বলিব।' রাজা বলিলেন, 'এই পৃথিবীতে রামের মতন আমি কাহাকেও ভালবাসি না। সেই রামের নাম লইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।'

এ কথা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'দেবতারা শুনুন, রাজা কী প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। মহারাজ, সেই দেবাসুর যুদ্ধের কথা মনে কর। সেই যে তুমি ভয়ানক ঘা খাইয়াছিলে, আর আমি তোমাকে বাঁচাইয়াছিলাম। তখন আমাকে যে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলে, আর আমি বলিয়াছিলাম দরকার হইলে লইব, আজ সেই দুই বর আমাকে দিতে হইবে। এখন তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি না দাও, তবে আমি নিশ্চয় মরিয়া যাইব।'

নিষ্ঠুর কৈকেয়ী বুঝিয়াছিলেন যে রাজা একবার 'দিব' বলিলে আর প্রাণ গেলেও 'দিব না' বলিতে পারিবেন না। তাই এখন সময় বুঝিয়া বলিলেন, 'রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য সন্ন্যাসী সাজাইয়া দণ্ডক বনে পাঠাইতে হইবে, আর ভরতকে রাজা করিতে হইবে।'

হায়, কী নিষ্ঠুর কথা! সেই ভয়ানক কথা শুনিয়াই দশরথ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। খানিক পরে একটু জ্ঞান হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু তখনই কৈকেয়ীর কথা মনে হওয়াতে আবার অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে আবার দশরথের জ্ঞান হইল। তখন তিনি ভয়ানক রাগের সহিত কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওরে নিষ্ঠুর দুষ্ট কৈকেয়ী, রাম তোর কি করিয়াছে? রাম এমন করিয়া তোর সেবা করে, আর তুই কি না তাহার সর্বনাশ করিতে বসিয়াছিস? কোন্ দোষে আমি রামকে তাড়াইব? হায় হায়, রাম গেলে আমি বাঁচিব কেমন করিয়া!'

ঐইরূপে কৈকেয়ীকে বিস্তর গালি দিয়া, তারপর দশরথ অতিশয় কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "কৈকেয়ী, তোমার পায়ে পড়ি, এমন কথা মুখে আনিও না! রাম তোমার যেমন সেবা করে, ভরতও তো তেমন করে না। আর বড় ছেলেই যে রাজা হয়, তাহাও তো তুমি জান। আমার রামের কত গুণ! এমন রামকে তোমার জন্য এরূপ নিষ্ঠুর কথা আমি কী করিয়া বলিব?

শেষে তিনি আবার বিনয় করিয়া বলিলেন, "কৈকেয়ী, আমি বুড়া হইয়াছি, আর বেশিদিন বাঁচিব না। আমাকে দয়া কর! আমার আর যাহা আছে সকলই দিতেছি; তোমার পায়ে পড়ি, রামকে ছাড়িবার কথা আমাকে বলিও না!'

দশরথ এইরূপে কত দুঃখ কত মিনতি করিলেন, কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কৈকেয়ীর কিছুতেই দয়া হইল না। তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, একবার বর দিয়া আবার এমন করিয়া কাঁদিতেছ? তুমি

তো খুব ধার্মিক দেখিতেছি! লোকে শুনিলে বলিবে কী? তুমি যাহাই বল, ও বর আমি কিছুতেই ছাড়িব না। রামকে যদি তুমি রাজা কর, তবে তখনই আমি বিষ খাইয়া মরিব।'

আহা, বুড়া বেচারার কী কষ্ট! এমন দুঃখ আর কেহ কি কখন পাইয়াছে? রাজা কখনও কাঁদেন, কখনও কৈকেয়ীকে গালি দেন। কখনও বলেন, 'হায়, কৌশল্যা কী বলিবেন?' কখনও বলেন, 'হায়, সীতার কী দশা হইবে?' কখনও আবার অজ্ঞান হইয়া যান। জ্ঞান হইলে আবার কখনও কৈকেয়ীকে বকেন, কখনও রামের জন্য দুঃখ করেন। একবার কৈকেয়ীর পা ধরিতে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণ তাঁহার জ্ঞান রহিল না।

এইরূপ করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। কৈকেয়ীর দয়া হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আরও বিদ্রুপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, সত্য কথা বল বলিয়া যে বড় অহঙ্কার করিয়া থাক, এখন আমাকে বর দিবার বেলা তাহা কোথায় গেল?' রাত ভোর হইয়া গেল, তখনও সেই একই কথা, 'মহারাজ, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন বর না দিয়া যাইবে কোথায়? শীঘ্র রামকে বনে পাঠাও, আর আমার ভরতকে রাজা কর!'

শেষে দশরথ বুঝিতে পারিলেন যে, আর রামকে বনে না দিয়া উপায় নাই। তখন তিনি বলিলেন, 'আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আর কী বলিব? তোর যাহা ইচ্ছা কর। আমি কেবল একটিবার রামকে দেখিতে চাই।'

ততক্ষণে সূর্য উঠিয়াছে। সেদিনকার কাজ আরম্ভ করিবার সময় হইয়াছে। রামকে বলিলেন, 'সুমন্ত্র, সব প্রস্তুত, সকলেই আসিয়াছেন, সময়ও হইয়াছে; শীঘ্র মহারাজকে সংবাদ দাও।' সুমন্ত্র সংবাদ দিতে গেলেন। এদিকে যে সর্বনাশ হইয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তিনি অন্যান্য দিনের মত গিয়া রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, সব প্রস্তুত। এখন মহারাজের অনুমতি হইলেই রামকে যুবরাজ করা যায়।'

সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া রাজার দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তখন সুমন্ত্র চমকিয়া গিয়া দেখিলেন যে, রাজার চোখ লাল, আর তাঁহাকে বড়ই কাতর দেখা যাইতেছে। তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনের দুঃখে কেবল জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজার কথা কহিবার শক্তি নাই। তাহা দেখিয়া মিথ্যাবাদী কৈকেয়ী নিজেই কহিলেন, 'দেখ সুমন্ত্র, রাজার মনে কিনা বড়ই আনন্দ হইয়াছে, তাই রাত্রে তাঁহার ঘুম হয় নাই। এখন তিনি একটু

ঘুমাইবেন। তুমি রামকে এইখানে লইয়া আইস।' এ কথায় সুমন্ত্র রামকে আনিতে গেলেন।

রাম তাঁহার নিজের বাড়িতে সীতার কাছে বসিয়া আছেন এমন সময় সুমন্ত্র সেখানে গিয়া বলিলেন, 'যুবরাজ, মহারাজ আর রানী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে চাহেন; শীঘ্র সেখানে চলুন।' রাম তখনই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পথের লোকেরা তাঁহার কতই প্রশংসা করিতে লাগিল, কতই আশীর্বাদ করিল।

রাজা দশরথ ভয়ানক দুঃখে অবশ হইয়া আছেন, কৈকেয়ী কাছে বসিয়া। এমন সময় রাম আসিয়া তাঁহাদের দু-জনকে প্রণাম করিলেন। দশরথ কেবল একটিবার তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'রাম!' আর কথা বাহির হইল না; খালি চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রামের মনে কী পর্যন্ত দুঃখ আর চিন্তা হইল, সহজেই বুঝিতে পার। তিনি কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আমি কি না জানিয়া কোন দোষ করিয়াছি?' বাবা কেন কথা কহিতেছেন না? তাঁহাকে কেন এমন কাতর দেখিতেছি? কোনও মন্দ সংবাদ আসিয়াছে কি? আপনি তো বাবাকে কিছু বলেন নাই?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'তোমার বাবার রাগও হয় নাই, কোন বিপদও হয় নাই। রাজার একটা কাজ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার ভয়ে তাহা বলিতে পারিতেছেন না। রাজা যখন কাজটা করিবেন বলিয়াছেন, তখন তুমি কিন্তু তাহাকে কোনরূপ বাধা দিও না; তাহা হইলে যে পাপ হইবে!' রাম বলিলেন, 'মা, এমন কথা কেন বলিতেছেন? বাবা যে কাজ করিবেন বলিয়াছেন, আমি কখনই তাহাকে বাধা দিব না। বাবার কথা কি অমান্য করিতে পারি?'

তাহা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'কথাটি বাপু আর কিছুই নয়। তোমার বাবা আগে আমাকে দুটি বর দিবেন বলিয়াছিলেন, সেই বর আমি আজ চাহিয়াছি। একটা বর এই যে, তুমি মাথায় জটা লইয়া গাছের ছাল পরিয়া চৌদ্দ বৎসরের জন্য দণ্ডক বনে যাইবে। আর একটা বর চাহিয়াছি যে, এই যে সব আয়োজন হইয়াছে, তাহা দিয়া ভরতই রাজা হইবে। তুমি বাছা রাজ্যের লোভ ছাড়িয়া দাও। মহারাজের কষ্ট হইতেছে বলিয়া মুখে এ সকল কথা বলিতে পারিতেছেন না, তাই আমি বলিলাম। পিতার কথা তোমার রাখা উচিত।'

এ কথা শুনিয়া দশরথ দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু রাম একটুও দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা মা, তাহাই করিব। এমন কী কাজ আছে,

বাবা বলিলে যাহা না করিতে পারি? আজই ভরতকে আনিতে দূত পাঠাইয়া দিন। আমিও আজই বনে চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু বাবা কেন নিজে আমাকে এ কথা বলিলেন না?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'বেশ বেশ ভরতকে আনিতে আজই ঘোড়ায় চড়িয়া লোক যাইবে। আর তুমিও দেখিতেছি বনে যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছ। শীঘ্র যাও! মহারাজের বড় লজ্জা হইয়াছে, তাই কতা বলিতেছেন না। কিন্তু তুমি যতক্ষণ চলিয়া না যাইতেছ, ততক্ষণ তাঁহার স্নানাহার নাই।'

এই কথা শুনিয়া দশরথ 'হায় হায়' করিতে করিতে আবার অজ্ঞান হইয়া গেলেন। বনে যাইবার কথায় রামের কোন কষ্টই হয় নাই, কিন্তু পিতার দুঃখে তিনি অস্থির হইলেন; 'হায়, পিতার একটু সেবাও করিতে পারিলাম না, কারণ এখনই বনে যাইতে হইবে!' কাজেই কোন রকমে রাজাকে একটু তুলিয়া বসাইয়া তাঁহাকে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে হইল।

কৈকেয়ীর ব্যবহারে লক্ষ্মণ রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রামের কিছুমাত্র দুঃখের ভাব দেখা গেল না। তিনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে কৌশল্যার বাড়িতে চলিলেন। সেখানে মেয়েরা সুন্দর সাজ পোশাক পরিয়া তাঁহারই জন্য আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল। তাহা দেখিয়াও তাঁহার দুঃখ হইল না। তাঁহার মনে কেবল এই ভাবিয়া দুঃখ হইল যে, তিনি গেলে হয়ত তাঁহার পিতা মাতা মরিয়া যাইবেন।

রামের বনবাসের কথা ততক্ষণে অনেকেই শুনিয়াছে, আর সকলেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাজার নিন্দা করিতেছে। কিন্তু মা কৌশল্যা তখনও ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাম যুবরাজ হইবেন, তাহাই তিনি জানেন, আর তাঁহার জন্য মনের সুখে দেবতার পূজা করিতেছেন। এমন সময় রাম সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রনাম করিলেন। কৌশল্যা আনন্দে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, 'বাবা, আজ তুমি যুবরাজ হইবে। আশীর্বাদ করি, অনেক দিন সুখে বাঁচিয়া থাক। ধর্মে তোমার মতি হউক, আর সকলে তোমাকে ভালবাসুক।'

রাম বলিলেন, 'মা, তোমার বড় দুঃখের সময় আসিয়াছে। তুমি তো জান না, মা, আমি এখনই দণ্ডকবনে যাইব। মহারাজ ভরতকে রাজ্য দিবেন, আমাকে তপস্বীর বেশ ধরিয়া চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে।'

আমরা অনেক সময়ে লোকের কষ্ট বুঝিতে পারি। কিন্তু হায়, আমাদের এমন কী সাধ্য আছে যে, মা কৌশল্যার প্রাণের কষ্ট বুঝিতে পারিব? তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন, সকলে সেবা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিল। জ্ঞান হইলে পর তিনি বলিলেন, 'বাছা রাম, তুমি যদি না হইতে, তবে আমার এত কষ্ট হইত না। এখন তোমাকে হারাইয়া আমি কী করিয়া বাঁচিব? হায় হায়, আমার বুকটা কি লোহার, যে এত দুঃখেও ফাটিয়া গেল না? আমার কি মরণ নাই? আহা, যমের ঘরে বুঝি আমার মত দুঃখিনীর জন্য একটু জায়গা হইবে না! বাছা, তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেইখানে যাইব। আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল।'

কৌশল্যার দুঃখ দেখিয়া লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'মা, দাদা কিসের জন্য বনে যাইবেন? মহারাজ এখন বুড়া হইয়াছেন, তাঁহার কি মাথার ঠিক আছে? তাহা না হইলে কেন স্ত্রীর কথায় ভুলিয়া এমন লোককে বনে পাঠাইতেছেন? এমন রাজার কথা না শুনিলে কী হয়?'

তারপর তিনি রামকে বলিলেন, 'দাদা, একবার হুকুম দাও তো দেখি, কে তোমাকে রাজ্য না দেয়! না হয় অযোধ্যার সব লোককে মারিব। বাবাকেও মারিব! আমার প্রাণ থাকিতে কাহার সাধ্য, দাদাকে ঠকাইয়া ভরতকে রাজ্য দেয়!'

আবার তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন, 'মা, আমি কি ভয় করি? তুমি আর দাদা দেখ, আমি কী করিতে পারি! বুড়া রাজাকে আমি এখনই মারিব!'

ইহা শুনিয়া কৌশল্যা বলিলেন, 'শোন তো বাবা, লক্ষ্মণ কী বলিতেছে! বাবা, তুমি বনে যাইওনা! তাহা হইলে আমি কখনই বাঁচিব না। মাকে মারিলে তোমার পাপ হইবে।'

কৌশল্যার কষ্ট দেখিয়া রামের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'মা, কাঁদিও না। বাবার কথা আমি কী করিয়া অমান্য করিব? ভাই লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে কত ভালবাস, তাহা কি আমি জানি না? তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু যাহাতে ধর্ম হয়, তাহাই আমাদের করা উচিত। কাজেই বাবা যখন বলিয়াছেন, তখন আমায় বনে যাইতেই হইবে।'

তারপর হাত জোড় করিয়া রাম কৌশল্যাকে বলিলেন, 'মা, তুমি বাধা দিও না। চৌদ্দ বৎসর দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। তারপর আবার তোমার কাছে আসিব।' কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, কেবল রাজাই কি তোমার গুরু? আমি কি কেহ নই? আমাকে এত কষ্ট দিয়া তুমি কেমন করিয়া যাইবে?'

রাম বলিলেন, 'বাবা ধর্ম ঠিক রাখিবার জন্যই আমাকে বনে পাঠাইতেছেন। আমাদের কি উচিত তাঁহার কথা অমান্য করা? মা, আমাকে বনে যাইবার অনুমতি দাও; আর আশীর্বাদ কর, যেন চৌদ্দ বৎসর পরে আবার আসিয়া তোমার পায়ের ধূলা লইতে পারি। তোমার পায়ে ধরি মা, আমাকে বাধা দিও না!'

এইরূপ করিয়া রাম কৌশল্যাকে কত বুঝাইলেন; লক্ষ্মণকে কত বুঝাইলেন; কিন্তু কৌশল্যা তবুও বলিলেন, 'বাবা, আমি এ দেশ ছাড়িয়া তোমার সঙ্গেই যাইব!'

রাম বলিলেন, 'দেখ মা, কৈকেয়ী ছল করিয়া বাবাকে কী ভয়ানক দুঃখে ফেলিয়াছেন! আমি তো বনে চলিলাম, তারপর তুমিও যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে কি বাবা বাঁচিবেন? মা, এমন কথা মনে ভাবিও না। যতদিন বাবা বাঁচিয়া আছেন, ততদিন তাঁহার সেবা কর। চৌদ্দ বৎসর পরে নিশ্চয় আমি আবার আসিব।'

এইরূপে রাম অনেক বুঝাইলে পর কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, কিছুতেই শুনিলে না? তুমি বনে যাইবেনই? হায়, আমার কপালে বুঝি কেবল দুঃখ লেখা ছিল! তবে এস বাবা! আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। হায়, আমার ভাগ্যে কি এমন দিন হইবে যে, তুমি আসিয়া আবার আমাকে মা বলিয়া ডাকিবে?'

এই বলিয়া তিনি ভক্তিভরে দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন, যাহাতে রামের কোন অমঙ্গল না হয়। পূজা শেষ হইলে তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখখানির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; চক্ষু আর ফিরিতে চাহে না। শেষে রাম তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সীতার নিকট বিদায় লইতে চলিলেন।

সীতাও বিপদের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই; কিন্তু রামের মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে একটা বিপদ হইয়াছে। রাম যখন বনে যাইবার কথা বলিলেন, তখন সীতা রাজ্য গেল বলিয়া কোন দুঃখ করিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব।' রাম অনেক নিষেধ করিলেন। বনে যত ক্লেশ যত ভয় আছে, তাহাদের কথা বলিয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সীতা তাহা শুনিবেন কেন? তিনি রামের গলা জড়াইয়া ধরিয়া এমন ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন যে, রাম কিছুতেই তাঁহাকে রাখিয়া

যাইতে পারিলেন না। কাজেই তখন আর কী করেন! তিনি বলিলেন, 'তবে চল; আমি যেমন করিয়া থাকিব, তুমিও তেমনি করিয়া থাকিবে। আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা ব্রাহ্মণদিগকে, চাকর-বাকরকে, আর গরিব দুঃখীকে বিলাইয়া চল আমরা শীঘ্র বনে যাই।'

লক্ষ্মণ রামের আগেই সেখানে আসিয়াছিলেন। রাম সীতার কথাবার্তা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'দাদা, যদি যাইবেই, তবে আমি ধনুক বাণ লইয়া তোমার আগে আগে যাইব। আমি তোমাকে চাড়িয়া থাকিতে পারিব না।' রাম বলিলেন, 'সে কী ভাই, তুমি যদি যাও, তবে মা কৌশল্যা আর মা সুমিত্রাকে কে দেখিবে?' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'মা কৌশল্যার জন্য কোন চিন্তা নাই। আর তিনি এত লোককে খাইতে দিতেছেন, তিনি কি মা সুমিত্রাকে দুটি ভাত দিতে পারিবেন না? দাদা, আমাকে সঙ্গে লও। আমি রোজ তোমাদের ফলমূল আনিয়া দিব।'

সুতরাং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইতে হইল। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে সকলের নিকট বিদায় লইয়া অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত। তারপর যাহাকে যাহা দিতে হইবে, রামের কথামত সকলকে তাহা দিতে লাগিলেন। চাকরেরা যাহা পাইল, তাহাতে তাহাদের চিরকাল সুখে কাটিবে। তাহা ছাড়া আবার রাম তাহাদিগকে বলিলেন, 'যতদিন আমরা ফিরিয়া না আসি, ততদিন আমাদের বাড়িতেই থাক।'

সে দেশে ত্রিজট নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঠাকুরটি বুড়া যতদূর হইতে হয়; আবার গরিব তাহার চেয়েও বেশি। সেই ব্রাহ্মণ রামের দানের কথা শুনিয়া কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত। রাম তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'ঠাকুর, আপনি এই লাঠিটা যত দূর ফেলিতে পারিবেন, ততদূর পর্যন্ত আমার যত গরু আছে সব আপনার।'

সেই বুড়া বামুনের গায়ে কী জোরটাই ছিল! তখন তিনি কসিয়া কোমর বাঁধিয়া, 'হেঁই-হো' শব্দে লাঠিগাছটাকে একেবারে সরযূ পার করিয়া দিলেন, ততদূর অবধি গণিয়া দেখা গেল, এক লক্ষ গরু। রাম ইহাতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সেই লক্ষ গরু তো তাঁহাকে দিলেনই, তাহা ছাড়া আরও অনেক ধন দিলেন।

এইরূপে সমস্ত ধন দান করিয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা দশরথের সহিত দেখা করিবার জন্য পথ দিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। তাহা দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল, 'হায় হায়, যে রাম কখনও একা পথ চলেন নাই, যে সীতা কখনও

ঘরের বাহির হন নাই, আজ কিনা তাঁহারা এমনিভাবে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। দশরথকে নিশ্চয়ই ভূতে পাইয়াছে, নহিলে যাই, কৈকেয়ী তাঁহার ছেলেকে লইয়া এইখানে পড়িয়া থাকুক!'

রামকে বিদায় দিতে দশরথের কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর আমি লিখিয়া কত জানাইব? কৈকেয়ীর ছল বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বর দিয়া বসিয়াছেন, কাজেই এখন আর নিজে কী করিয়া না বলেন! কিন্তু রাম তাঁহার কথায় বনে যান, ইহা তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা নহে। তাই তিনি রামকে বলিলেন, 'বাছা রে, তুমি আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া নিজে অযোধ্যার রাজা হও।' রাম বলিলেন, 'বাবা, আপনি আরও হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া সুখে রাজ্য করুন। আমি রাজ্য চাহি না। আমি বনে গিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রাখিব, তারপর আবার আপনার পায়ের ধূলা লইতে আসিব।'

আর একটি দিন রামকে রাখিতে পারিলেও হয়ত দশরথের মনে কতকটা আরাম হইত। কিন্তু আর একটি দিনও তাঁহাকে রাখিবার উপায় নাই, কারণ সেদিনই তাঁহার যাইবার কথা।

শেষে দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন, 'রামের সঙ্গে অনেক সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র আর গাড়ি ঘোড়া দাও। শহরের লোকেরা তাঁহার সঙ্গে যাউক। লোকজন, টাকাকড়ি কিছুতেই যেন তাঁহার কষ্ট না হয়।'

ইহা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'মহারাজ, সবই যদি রামের সঙ্গে পাঠাইবেন, তবে আমার ভরতের রাজা হইয়াই বা কী লাভ?'

রাম বলিলেন, 'বাবা, এ সকল কিছুই চাহি না। আমার একখানা খন্তা, একটি পেঁটরা, আর খানকতক ছেঁড়া ন্যাকড়া হইলেই চলিবে।' এই কথা বলিতে বলিতেই কৈকেয়ী তিন টুকরা ন্যাকড়া লইয়া উপস্থিত। রাম, লক্ষ্মণ ভাল কাপড় ছাড়িয়া ন্যাকড়া পরিলেন। কিন্তু হায়, সীতা তো জানেন না কেম করিয়া ন্যাকড়া পরিতে হয়! তিনি শুধু তাহা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুতরাং রামকেই নিজ হাতে সেই ন্যাকড়াখানা তাঁহার রেশমী শাড়ির উপরে জড়াইয়া দিতে হইল। তাহা দেখিয়া কাহার সাধ্য, চোখের জল থামাইয়া রাখে!

তখন বশিষ্ঠ সীতাকে ন্যাকড়া পরাইতে বারণ করিয়া কৈকেয়ীকে অনেক বকিলেন। দশরথও বলিলেন, 'সীতাকে ন্যাকড়া পরাইতে হইবে, এমন বর তো আমি কখনও দিই নাই! সীতা সকল রকম ধনরত্ন লইয়া যাউক।'

সকলের শেষে রাম হাত জোড় করিয়া দশরথকে বলিলেন, 'মহারাজ, আমার দুঃখিনী মাকে দেখিবেন।'

এদিকে যাইবার সময় উপস্থিত। সুমন্ত্র রথ সাজাইয়া প্রস্তুত। সুতরাং তিনজনে সকলকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। রানী সুমিত্রা তখন লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, 'বাবা, তুমি রামের সহিত যাও। সকল সময় তাঁহার কাছে থাকিও। রাম ছাড়া তোমার আর কেহ নাই। রামকে মনে করিও যেন রাজা দশরথ, সীতাকে মনে করিও যেন আমি, আর বনকে মনে করিও যেন অযোধ্যা। যাও বাছা, মনের সুখে চলিয়া যাও।'

তারপর আগে সীতাকে সুন্দর কাপড় পরাইয়া রথে তুলিয়া দেওয়া হইল। পরে রাম লক্ষ্মণ অস্ত্রশস্ত্র, পেটরা, আর সীতার চৌদ্দ বৎসরের মতন কাপড় লইয়া তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া বসিলেন। রথ চলিতে দেখিয়া সকলে পাগলের মত হইয়া তাহার সঙ্গে ছুটিল। যখন রথের সঙ্গে আর ছুটিতে পারে না, তখন তাহারা অতি কাতরভাবে সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিল, 'ও সুমন্ত্র, একটু আস্তে যাও! আমরা যে আর পারি না!'

রাম অনেক সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু এতটা কী সহা যায়? নিজে দশরথ, এমনকি রানীরা অবধি ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কান্নায় বুঝি পাথরও গলিয়া যায়, মানুষ তো মানুষ! রাম অস্থির হইয়া সুমন্ত্রকে ক্রমাগত বলিতেছেন, 'জোরে চালাও! কিন্তু সুমন্ত্র জোরে চালাইবেন কি? এদিকে যে রাজা নিজে বলিতেছেন, 'রথ থামাও! মা কৌশল্যা হা রাম! হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া এলোচুলে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক, সুমন্ত্র যখন দেখিলেন যে রাম আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি রথ খুব জোরেই চালাইয়া দিলেন। কাজেই তখন আর রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে না পারিয়া প্রায় সকলকেই ফিরিতে হইল।

দশরথকেও অনেক কষ্টে ফিরানো হইল। কিন্তু যতক্ষণ রথের ধূলা দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণে তাঁহাকে ঘরে আনা গেল না। রথের দিকে চাহিয়া তিনি সেইখানে মাটিতে বসিয়া রহিলেন, আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই। রথ চোখের আড়ালে চলিয়া গেলে, আর বসিয়াও থাকিতে পারিলেন না।

একটু সুস্থ হইলে পর দশরথ কৌশল্যার হাতখানি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে চলিলেন–কৈকেয়ীর ঘরে নহে, কৌশল্যার ঘরে। কৈকেয়ী রাজাকে নিতে আসিলেন; কিন্তু রাজা বলিলেন, 'তুই আমাকে ছুঁইস না!'

কৌশল্যার ঘরে আসিয়া দশরথ সেই যে বিছানায় শুইলেন, তাহাই তাঁহার শেষ শয়ন। কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে অনেক কষ্টে কৌশল্যাকে বলিলেন, 'আমি যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না! আমার গায়ে হাত দাও!' কৌশল্যা রাজার কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া সুমিত্রা বলিলেন, 'দিদি, এত দুঃখ কেন করিতেছ? রাম কেমন বীর, তাহা কি জান না? লক্ষ্মণও তাহার সঙ্গে গিয়াছে, তাহাদের কিসের ভয়? আবার তাহারা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবে!' সুমিত্রার কথা শুনিয়া কৌশল্যা অনেক শান্ত হইলেন।

দশরথকে যখন ফিরাইয়া আনা হইল, তখনও অযোধ্যার অনেক লোক রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছিল। তাহারা কিছুতেই ফিরিতে চাহিল না। তাহাদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের গায়ে জোর নাই, মাথা কাঁপে, তবুও তাঁহারা যাইবেনই। তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা রথ হইতে নামিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'বাছা রাম, আমরা যাইব।'

এইরূপে তাঁহারা তমসা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। কাজেই সেখানেই রাত্রিতে থাকিবার আয়োজন হইল।

ভোরে উঠিয়া রাম দেখিলেন যে, অযোধ্যার লোকেরা তখনও ঘুমাইতেছে। তখন রথ সাজাইয়া আনিলেন, কিন্তু রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তাহাতে চড়িয়া আর বেশি দূর গেলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা রথ হইতে নামিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, 'তুমি রথখানিকে উত্তর দিক হইতে ঘুরাইয়া আন।' শুধু রথ হালকা বলিয়া পথে কিনা তাহার দাগ পরিবে না, তাই রাম শুধু রথ খানিকে ঘুরাইয়া আনিতে দিলেন। তিনি জানিতেন যে, ঐরূপ করিলে আর অযোধ্যঅর লোকেরা রথের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। তাই তাঁহারা পথ ছাড়িয়া বনের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন, আর সুমন্ত্র শুধু রথখানিকে কিছু দূরে ঘুরাইয়া আনিয়া, অন্য এক স্থান হইতে আবার তাঁহাদের তিনজনকে তুলিয়া লইলেন। এদিকে তমসা নদীর ধারে সেই লোকগুলি জাগিয়া দেখিল যে, রাম নাই। তখন তাহারা এই বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল, 'হায় হায়, কেন ঘুমাইলাম? আমাদের ভাগ্যে কি এই ছিল? রাম কি শেষে এইরূপ করিয়া আমাদিগকে ফেলিয়া গেলেন?' কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা রথের চিহ্ন দেখিয়া খানিক দূরে গেল। কিন্তু তাহার পরে রথ কোন্

দিকে গিয়াছে আর কিছু বুঝিতে পারিল না। কাজেই তখন নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

সমস্তদিন রথ চালাইয়া, রাম বিকালে শৃঙ্গবের নগরের নিকট গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি সুন্দরী ইঙ্গুদী গাছ দেখিয়া বলিলেন, 'এই গাছতলায় আজ আমরা থাকিব।'

এই স্থানের রাজার নাম গুহ। তিনি রামের বন্ধু। রাম আসিয়াছেন শুনিবামাত্রই গুহ তাড়াতাড়ি অনেক লোকজন আর ভাল ভাল খাবার জিনিস লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামের থাকিবার জন্য সুন্দর বিছানা, ঘোড়ার জন্য ঘাস, কিছুই আনিতে তিনি বাকি রাখেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা যে, রামকে তাঁহাদের রাজা করিয়া সেইখানেই রাখেন।

রাম আদরের সহিত তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, 'ভাই, তোমার ভালবাসাতেই আমার যার-পর-নাই সুখ হইয়াছে। কিন্তু তোমার জিনিস আমি কি করিয়া লইব? আমায় যে তপস্বীর মতন ফল মূল খাইয়া থাকিতে হইবে। আমাদের কিছুই দরকার নাই, কেবল ঘোড়াগুলিতে দুটি ঘাস দিতে বল।' কাজেই গুহ রামকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। রাম সীতা জল মাত্র খাইয়া গাছতলায় শুইয়া রহিলেন।

রাত্রিতে রাম ঘুমাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গুহ মনের দুঃখে বলিলেন, 'রাজপুত্র, আমরাই জাগিয়া বন্ধুকে পাহারা দিব, আপনি ঘুমান।' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদার এই দুঃখের সময় আমি কেমন করিয়া ঘুমাইব? ইহার পর বাবা আর বেশি দিন বাঁচিবেন না। তখন মা কৌশল্যা আর সুমিত্রাও নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবেন।' লক্ষ্মণের আর গুহের ঘুম হইল না, সমস্ত রাত্রি তাহাদের কাঁদিয়াই কাটিল।

পরদিন সকালে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া আর গুহের নিকট বিদায় লইয়া রাম লক্ষ্মণ আর সীতা নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন। বুড়া সুমন্ত্রের কি আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে পা চলে? রামের সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি কতই না মিনতি করিয়াছিলেন! কিন্তু রাম বলিলেন, 'তুমি যদি অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাও, তবে কৈকেয়ী মনে করিবেন যে আমি বুঝি বনে যাই নাই। তাহা হইলে বাবাকে তিনি বড়ই কষ্ট দিবেন। তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও।' সুতরাং সুমন্ত্র আর রামের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। তিনি একদৃষ্টে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন আর রামকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গঙ্গা পার হইবার পূর্বেই রাম লক্ষ্মণ বটের আঠায় জটা পাকাইয়া তপস্বী সাজিয়াছিলেন। গঙ্গানদীর পরপারে বৎসদেশ। সেখানে হরিণ মারিয়া খাইয়া, তাঁহারা বর্ম পরিয়া ধনুর্বাণ হাতে বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এক রাত্রি তাঁহাদের সেই বনের ভিতরেই কাটিল। তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা প্রয়াগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের নিকট গঙ্গার সহিত যমুনা আসিয়া মিলিয়াছে।

রাম লক্ষ্মণ ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিলে পর তিনি তাঁহাদিগকে অনেক আদর যত্ন করিলেন। ভরদ্বাজ রামকে তাঁহার আশ্রমেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে স্থানের খুব কাছেই লোকজনের বাড়ি ছিল বলিয়া রামের সেখানে থাকিতে তত ভাল লাগিল না। তিনি ভরদ্বাজকে বলিলেন, 'দয়া করিয়া আমাদিগকে একটি নির্জন ভাল জায়গা দেখাইয়া দিন।' ভরদ্বাজ বলিলেন, 'তবে তুমি এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট পর্বতে গিয়া বাস কর। চিত্রকূট খুব সুন্দর আর নির্জন স্থান। সেখানে ফল ফুল, নদী ঝরণা, পাখি, হরিণ অনেক আছে। সে স্থানটি তোমাদের বেশ ভাল লাগিবে।'

তাহার পরদিনই তাঁহারা ভরদ্বাজকে প্রণাম করিয়া চিত্রকূট যাত্রা করিলেন। পথে যমুনা নদী পার হইতে হয়। নদীর ধারে শুকনা কাঠের অভাব নাই। খসখসের দড়িতে সেই কাঠ বাঁধিয়া পার হইবার জন্য ভেলা প্রস্তুত হইল। ভেলার উপর আবার জামের আর বেতের ডাল দিয়া একটা গদি করিতেও বাকি রহিল না—সীতার বসিবার জন্য একটু মোলায়েম জায়গা তো চাই। এই কারিকুরিটি অবশ্য লক্ষ্মণের; সীতার সুবিধা করিতে সর্বদাই ব্যস্ত। এই ভেলায় জিনিসপত্র -সুদ্ধ তাঁহারা নদী পার হইলেন।

তারপর আগে লক্ষ্মণ, মাঝখানে সীতা, পিছনে রাম—এইরূপ করিয়া তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন। পথের দুই ধারে সুন্দর ফুল ফুটিয়া আছে; সীতা তাহা পূর্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি তাঁহার মিষ্টি কথায় রামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এটি কী ফুল? অমনি লক্ষ্মণ তাহা তুলিয়া আনিয়া দেন।

এইরূপ এক দিন পথ চলিয়া তাঁহারা চিত্রকূট পর্বতের কাছে আসিলেন। সে স্থানটি অতি চমৎকার। তাহার কাছে মন্দাকিনী নামে অতি সুন্দর একটি নদী। সেই নদীর ধারে তাঁহারা কাঠ আর লতাপাতা দিয়া সুন্দর একখানা ঘর বাঁধিলেন। মণিমাণিক্যের কাজ করা মার্বেল পাথরের বাড়িতে থাকা যাঁহাদের

অভ্যাস, এখন তাঁহাদের থাকিবার জায়গা হইল একটি কুঁড়ে। সে কুঁড়ে ঘরখানিতে তাঁহাদের বেশ সুখেই দিন কাটিতে লাগিল।

সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া দশরথের দুঃখ আরও বাড়িয়া গেল। প্রথমে তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞান হইলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুমন্ত্র, তুমি চলিয়া আসার সময় তাহারা কী বলিল?' সুমন্ত্র বলিলেন, 'রাম আপনাদের সকলকে প্রণাম জানাইয়াছেন; আর বলিয়াছেন, "মাকে বলিও, তিনি যেন সর্বদা বাবার সেবা করেন। ভরতকে বলিও, তিনি যেন রাজা হইয়া বাবাকে অমান্য না করেন।" লক্ষ্মণ রাগের সহিত বলিলেন, "সুমন্ত্র, বাবা যখন দাদাকে বনে পাঠাইয়াছেন, তখন আর তাঁহার উপরে আমার একটু ও ভক্তি নাই।" সীতা কিছুই বলেন নাই, তিনি কেবল হেঁটমুখে চোখের জল ফেলিয়াছেন, আর এক-এক বার রামের মুখের দিকে আর রথের দিকে তাকাইয়াছেন।'

ইহার পর রাজা দশরথ ক্রমেই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি আর অধিকক্ষণ বাঁচিবেন না। যখন তাঁহার বয়স অল্প ছিল, তখন তিনি একবার অন্ধকার রাত্রিতে হাতি মনে করিয়া একটি অন্ধ মুনির ছেলেকে তীর দিয়া মারিয়া ফেলেন। তাহাতে সেই অন্ধ মুনি দুঃখে মরিয়া যান, আর মরিবার পূর্বে দশরথকে এই বলিয়া শাপ দেন, 'তোমারও এইরূপে পুত্রের শোকে প্রাণ যাইবে।'

মৃত্যুর সময় সেই কথা মনে করিয়া দশরথ দুঃখ করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমে তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিল। শেষে 'হা রাম! হা কৌশল্যা! হা সুমিত্রা! হা রে দুষ্ট কৈকেয়ী!' এই বলিতে বলিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁর প্রাণ বাহির হইয়া গেল। রামকে বনে পাঠাইয়া ছয়দিন মাত্র দশরথ বাঁচিয়াছিলেন।

রামের জন্য ক্রমাগত কয়েকদিন দুঃখ করিয়া করিয়া সকলে একেবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দশরথের মৃত্যুর সময় কেহই টের পান নাই দিন দশরথকে জাগাইতে গিয়া সকলে দেখিলেন যে তিনি মরিয়া গিয়াছেন। তখন আবার কান্না আরম্ভ হইল।

এইরূপে দুঃখের উপর আবার দুঃখ আসিয়া সকলকে যে কিরূপ অস্থির করিয়াছিল, তাহা কী বলিব! এদিকে ভরত শত্রুঘ্নও বাড়ি নাই। তাঁহারা না আসিলে দশরথকে পোড়ানোও যাইতেছে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি ভরত

শত্রুঘ্নকে আনিতে লোক গেল। আর যতদিন তাঁহারা না আসেন, ততদিনের জন্য দশরথকে তৈলের কড়ার ভিতরে রাখিয়া সকলে তাঁহাদের পথ চাহিয়া রহিলেন।

ভরত মামার বাড়িতে সুখেই ছিলেন। এ সকল বিপদের কথা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, রাজা দশরথ অত্যন্ত ময়লা হইয়া গিয়াছেন, আর একটা পাহাড় হইতে পড়িয়া যাইতেছেন। পাহাড়ের নিচে তৈল ছিল, তিনি সেই তৈলে ডুবিয়া গেলেন। তারপর গাধার গাড়িতে চড়িয়া তিনি দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলেন।

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ভরতের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। তাই তিনি আর পরদিন বন্ধুগণের সহিত ভাল করিয়া আমোদ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে অযোধ্যা হইতে লোক আসিয়া বলিল, 'রাজকুমার, আপনি শীঘ্র চলুন। সেখানে এমন কিছু হইয়াছে যে, আপনার দেরি হইলে ক্ষতি হইতে পারে।'

এইসকল শুনিয়া ভরত তাড়াতাড়ি অযোধ্যায় চলিয়া আসিলেন। অযোধ্যায় আসিয়া দেখেন যে, তাহার আর আগের মত চেহারা নাই, রাস্তায় লোকজন চলিতেছে না, দোকান পাট বন্ধ, আর সকলেরই মুখ অতিশয় মলিন। দশরথের ঘরে গিয়া দেখিলেন তিনি সেখানে নাই, সুতরাং সেখান হইতে কৈকেয়ীর ঘরে গেলেন।

কৈকেয়ী হাসিভরা মুখে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল আছ তো? পথে কোন কষ্ট হয় নাই?' ভরত বলিলেন, 'আসিতে একটু পরিশ্রম হইয়াছে। কিন্তু মা, এত তাড়াতাড়ি কেন আমাকে ডাকিয়া আনিলে? বাবা কোথায়?' কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, তোমার বাবা মরিয়া গিয়াছেন।'

এ কথা শুনিয়া ভরত 'হায় হায়' করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞান হইলে পর কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, তোমার বুদ্ধি হইয়েছে, তুমি কেন এত অস্থির হইতেছ?' ভরত বলিলেন, 'হায়! বাবা আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গেলেন! মা, বাবার কী অসুখ হইয়াছিল? মরিবার সময় তিনি কী বলিয়া গিয়াছেন?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'বাছা, মরিবার সময় তোমার বাবা বলিয়াছেন, "হা রাম! হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!" আর বলিয়াছেন যে, যাহারা রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে দেখিবে, তাহারাই সুখী।'

এ কথা শুনিয়া ভরত বলিলেন, 'মা, দাদা তবে এখন কোথায়?' কৈকেয়ী বলিলেন, 'তোমার দাদা সীতা আর লক্ষ্মণকে লইয়া বনে গিয়াছেন।' ভরত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাদা কী জন্য বনে গিয়াছেন? তিনি এমন কী অন্যায় করিয়াছেন যে তাঁহাকে বনে পাঠানো হইল?'

কৈকেয়ী বলিলেন, 'তিনি কোন অন্যায় কাজ করেন নাই। আমিই রাজাকে বলিয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইয়াছি। রাজা আমাকে দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি এই দুই বর লইয়াছি যে, রাম বনে যাইবে, আর তুমি রাজা হইবে। এখন এ সব তোমার হইল, তুমি রাজা হইয়া সুখে থাক।'

ভরতকে সুখী করিবার জন্যই কৈকেয়ী এমন পাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভরত যে রামকে কতদূর ভালবাসিতেন, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার কাজে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, ভরত দুঃখে আর রাগে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এতই রাগ হইল যে, কৈকেয়ী তাঁহার মা না হইলে হয়ত তিনি তাঁহাকে মারিয়াই ফেলিতেন।

ভরত বলিলেন, 'দাদা যদি তোমাকে এত মান্য না করিতেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে এখনই তাড়াইয়া দিতাম! তুমি রাজার মেয়ে, আর তোমার এই কাজ! যাহা হউক, তুমি যাহা করিয়াছ তাহা আমি কখনই হইতে দিব না। আমি এখনই দাদাকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি। তোমার মত দুষ্ট স্ত্রীলোক আর এই পৃথিবীতে নাই! তুমি কেন আগুনে পুড়িয়া, না হয় গলায় দড়ি দিয়া মর না? না হয় বনেই চলিয়া যাও না?'

তারপর ভরত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি কখনও রাজ্য চাহি না। দাদার রাজ্য আমি কেন লইব? আমি মামার বাড়ি গিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে মা এত কান্ড করিয়া বসিয়াছেন, আমি ইহার কিছুই জানি না।' এই বলিয়া তিনি শত্রুঘ্নকে লইয়া কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন।

কৌশল্যাও ভরতের গলা শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকটেই আসিতেছিলেন। পথে দুইজনের দেখা হইল। ভরতকে দেখিয়া কৌশল্যা বলিলেন, 'বাবা, এখন তুমি তো রাজ্য পাইয়াছ, তুমি সুখে থাক। আর এই দুঃখিনীকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।' এই কথায় ভরত কৌশল্যার পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তখন কৌশল্যাও তাঁহাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভরতের কোন দোষ নাই।

দশরথ তখনও সেই কড়ার মধ্যে তৈলের ভিতরে আছেন। তাঁহাকে পোড়াইতে আর বিলম্ব করা যায় না। সুতরাং পরদিন বশিষ্ঠ অনেক কষ্টে ভরতকে একটু শান্ত করিয়া সেই কাজের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে দশরথকে পোড়ানো আর তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সকলই হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন ভরত আর শত্রুঘ্ন কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময় কুঁজী ভারি সাজ-গোজ করিয়া সখীদের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গহনা পরিয়া, চন্দন মাখিয়া, তাহার মুখে হাসি আর ধরে না! বোধহয় মনে ভাবিয়াছিল যে খুব বড়রকমের একটা কিছু পুরস্কার পাইবে। পুরস্কারটি কী হইল, বলি শুন।

যেই কুঁজী সেখানে আসিল, অমনি ভরত তাহাকে ধরিয়া শত্রুঘ্নের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই হতভাগীই সকল অনিষ্টের গোড়া! এখন ইহাকে যাহা করিতে হয় কর।' শত্রুঘ্নও পাপিষ্ঠাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া বেশ ভালমতই তাহাকে পুরস্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। সখীরা তো ভয়ে দে-ছুট। তখন ভরত বলিলেন, 'ভাই, ওটাকে মারিয়া ফেলিও না। স্ত্রীলোককে মারিয়াছ শুনিলে দাদা রাগ করিবেন।' সুতরাং শত্রুঘ্ন কুঁজীকে ছাড়িয়া দিলেন, কুঁজীও পলাইয়া বাঁচিল।

এইরূপ করিয়া দশরথের মৃত্যুর পর তের দিন গেল। তখন একজন রাজা না হইলে কাজই চলিতেছে না। সুতরাং সকলেরই ইচ্ছা, এখন ভরত রাজা হন। কিন্তু ভরত বলিলেন, 'চল, দাদাকে লইয়া আসি। দাদাই রাজা হইবেন, আর আমি চৌদ্দ বৎসর বনে গিয়া থাকিব।' তখন সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিল। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া, মন্ত্রী, পুরোহিত, চাকর-বাকর, সিপাহী, সৈন্য, সকলেই চলিল। অযোধ্যার লোক কেহই পড়িয়া থাকিল না। রথে চড়িয়া, হাতি চড়িয়া, ঘোড়া গাধা উটে চড়িয়া, না হয় হাঁটিয়া, যে যেমন করিয়া পারিয়াছে সেইরূপ করিয়াই চলিয়াছে। এক লক্ষ ঘোড়সোয়ার, নয় হাজার হাতি, ষাট হাজার রথ, তাহা ছাড়া সিপাহী সান্ত্রী, আর লোকজন যে কত, তাহার ঠিকানা নাই। এমনি করিয়া তাহারা রামকে আনিতে চলিল।

তাহারা যখন গুহের দেশে আসিল, তখন গুহ এত সৈন্য আর লোকজন দেখিয়া প্রথমে একটু ভয় পাইলেন। তাই তিনি তাঁহার নিজের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভরত কি রামের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছেন? আমি থাকিতে তিনি তাহা পারিবেন না! চল, আমরা তাঁহার পথ আটকাই। আর যদি তাঁহার মনে কোন মন্দ ভাব না থাকে, তবে তাঁহার কোন ভয় নাই।'

এই কথা বলিয়া তিনি ভরতের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। ভরতের কাছে যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার মনে খুবই সুখ হইল।

গুহকে দেখিয়া সকলে রাম লক্ষ্মণ আর সীতার সংবাদ শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বনে যাইবার সময় গুহের দেশে আসিয়া তাঁহারা কোথায় ছিলেন, কী খাইয়াছিলেন, কী কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কোন কথাই না শুনিয়া তাহারা ছাড়িল না। রাম সীতা কুশ বিছাইয়া ইঙ্গুদী গাছতলায় ঘুমাইয়াছিলেন, সেই ইঙ্গুদী গাছতলার সেই কুশ তখনও রহিয়াছে। গুহ সকলকে তাহাও দেখাইলেন।

পরদিন গুহের লোকেরা পাঁচশত নৌকা আনিয়া ভরতকে গঙ্গা পার করিয়া দিল। গুহনিজে ভরতের সঙ্গে চলিলেন। গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌছেতে তাঁহাদের অধিক দিন লাগিল না। ভরত রামকে আনিতে যাইতেছেন শুনিয়া ভরদ্বাজ মুনি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আর কী বলিব! ভরতকে তিনি বলিলেন, 'তোমার লোকজন -সুদ্ধ আমার এখানে নিমন্ত্রণই খাইয়া যাইতে হইবে।'

আর, কী আশ্চর্য নিমন্ত্রণই তিনি তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন! কেহ হয়ত বলিবে যে, মুনি এত টাকাকড়ি কোথায় পাইলেন যে ভরতের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন! কিন্তু কেবল টাকা হইলেই কি সব হইল? তপস্যার দ্বারা ভরদ্বাজ যাহা করিলেন, টাকায় তাহা হয় না। মুনির তপস্যার জোরে তাঁহার আশ্রমে কোরমা আর পায়সের দিঘি হইল, সরবতের নদী বহিল।

ভরতের লোকেরা যে সে নিমন্ত্রণ খাইয়া অবাক হইবে, তাহা আর আশ্চর্য কী? এরূপ নিমন্ত্রণ কি কেহ কোথাও খাইয়াছে? না এত আয়োজন কেহ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে? নিজে দেবতারা আসিয়া ভরদ্বাজের আয়োজন করিয়াছিলেন; আর গন্ধর্বেরা আসিয়া সেখানে গান গাহিয়াছিলেন।

এইরূপে ভরদ্বাজের আশ্রমে নিমন্ত্রণ খাইয়া সকলে চিত্রকূট রওয়ানা হইলেন। ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যমুনা নদীর দক্ষিণ ধার দিয়া খানিক দূরে যাও। তারপর বাম দিকে যে দক্ষিণমুখো পথ গিয়াছে, সেই পথে গেলে রামের সন্ধান পাইবে।'

সেই পথে অনেক দূর চলিয়া, শেষে তাঁহাদের মনে হইল যে হয়ত রাম আর বেশি দূরে নাই। তখনই দুই-একজন লোক বনের ভিতরে ঢুকিয়া

দেখিল, এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে, সেই বনেই রাম আছেন। তখন ভরত সঙ্গের লোকদিগকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া নিজেই তাঁহাদিগকে খুঁজিতে চলিলেন।

এদিকে ভরতের লোকজন অনেক দূরে থাকিতেই রাম লক্ষ্মণ একটা শালগাছে গিয়া শুনিতে পান, এবং উহা কিসের কলরব তাহা জানিবার জন্য লক্ষ্মণ একটা শালগাছে গিয়া উঠেন। সেখান হইতে চারিদিক দেখিয়া তিনি রামকে বলিলেন, 'দাদা, শীঘ্র আগুন নিভাইয়া ফেল, আর বর্ম পরিয়া তীর ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও! ভরত আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে আসিয়াছে! আজ ভরতকে আর তাহার সকল সৈন্যকে মারিব, তবে ছাড়িব!'

এ কথায় রাম বলিলেন, 'ভাই, ভরত কি কখনও তোমার অনিষ্ট করিয়াছে। তবে কেন তাহাকে সন্দেহ করিতেছ?'

ইহাতে লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'বোধহয় বাবা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।' রাম বলিলেন, 'তাহা হইতে পারে। আমরা বনে থাকিয়া কষ্ট পাইতেছি, তাই বোধহয় বাবা আমাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে তো সকল সময়েই প্রকাণ্ড সাদা ছাতা থাকে। সে চাতা কই? তুমি শীঘ্র গাছ হইতে নামিয়া আইস।'

এদিকে ভরত খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে রামের ঘরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। লতাপাতার ঘরখানি, তাহার ভিতরে রামের ধনুক দেখা যাইতেছে। আরও কাছে আসিলে দেখিলেন, রাম ঘরের ভিতর চামড়ার আসনে বসিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন; পরনে গাছের ছাল, মাথায় জটা। তাহা দেখিয়া ভরতের মনে কী কষ্টই হইল! তিনি ছুটিয়া চলিলেন, কিন্তু পৌছিবার আগেই পড়িয়া গেলেন। মুখ দিয়া কেবল 'দাদা' এই কথাটি মাত্র বাহির হইয়াছিল, আর কথা সরিল না। ততক্ষণে শত্রুঘ্নও কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া রামের পায়ে পড়িলেন। তারপর চারি ভাই গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহারা একটু শান্ত হইলে পর রাম বলিলেন, 'ভরত, বাবা এখন কোথায়? তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কেন আসিলে?' ভরত বলিলেন, 'দাদা, বাবা তোমার জন্য দুঃখ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া গিয়াচেন। এখন আমরা তোমাকে লইতে আসিয়াছি। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমাদের সঙ্গে চল!' এই বলিয়া ভরত রামের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

দশরথের মৃত্যুসংবাদে রাম কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'ভাই, বাবা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমারও করা উচিত, আমাকে যখন বনে পাঠাইয়াছেন, তখন আমি অযোধ্যায় কী করিয়া যাইব? আর তোমাকে যখন তিনি রাজা হইতে বলিয়া গিয়াছেন, তখন তুমিই বা কী করিয়া সে কথা অমান্য করিবে?'

তারপর দশরথের তর্পণ করিবার জন্য রাম মন্দাকিনী নদীর ধারে আসিলেন। তর্পণ শেষ হইলে আবার কান্না আরম্ভ হইল। সেই কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ভরতের সঙ্গে লোকেরা আর দূরে বসিয়া থাকিতে পারিল না।

ততক্ষণে বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। যাহা কিছু বেলা ছিল, তাহাও সকলের দেখাশুনা, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদিতে কাটিয়া গেল। তারপর রাত্রি কেমন করিয়া কাটিল, তাহার কথা আর বেশি বলিয়া কী ফল? এত দুঃখ যাহাদের, তাহারা সে রাত্রি কেমন দুঃখে কাটাইয়াছিল, তাহা তোমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছ।

পরদিন রামকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল। কিন্তু রাম কিছুতেই যাইতে চাহিলেন না। কেবল চেষ্টা করে কী হইবে? তাঁহাকে তো এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া চাই যে, বনে যাওয়া উচিত নহে, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। নহিলে তিনি যাইবেন কেন? ভরত অনেক মিনতি করিয়াছিলেন বটে, বশিষ্ঠ ও নানারূপ মিষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন। জাবালি নামক আর একজন পুরোহিত তাঁহার সহিত রীতিমত তর্কই জুড়িয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সকলকেই তাঁহার নিকট হার মানিতে হইল।

তখন ভরত বলিলেন, 'দাদা, যদি নিতান্তই না যাইবে, তবে তোমার পায়ের খড়ম দু-খানি আমাকে খুলিয়া দাও। এখন হইতে এই খড়মই আমাদের রাজা। আমরা ইহার চাকর। তোমার এই খড়ম লইয়া চৌদ্দ বৎসর তোমার মত গাছের ছাল পরিয়া, ফলমূল খাইয়া, অযোধ্যার বাহিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তাহার পরের বৎসরের প্রথম দিনে যদি তুমি ফিরিয়া না আইস, তবে আগুনে পুড়িয়া মরিব!'

রাম ভরতকে খড়ম দিয়া বলিলেন, 'চৌদ্দ বৎসর পরে অবশ্য ফিরিব। ভাই, আমার মাকে দেখিও। এই বলিয়া রাম ভরতকে বিদায় দিলেন। তারপর ভরত সেই খড়মকে হাতির উপর চড়াইয়া অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন। সেখানে রানীদিগকে রাখিয়া তিনি মন্ত্রী আর পুরোহিতদিগকে বলিলেন, 'দাদা

যতদিন না আসেন, ততদিন আর অযোধ্যায় থাকিতে পারিব না। চলুন আমরা নন্দীগ্রামে যাই।'

নন্দীগ্রাম অযোধ্যার কাছেই। ভরত সেখানে গিয়া রামের খড়মকে সিংহাসনের উপর রাখিলেন। নিজে গাছের ছাল পরিয়া সেই খড়মের উপর ছাতা ধরিতেন, চামরের বাতাস করিতেন। রাজ্যের কোন কাজ আরম্ভ হইলে আগে খড়মের কাছে না বলিয়া কিছুই করিতেন না।

ভরত চলিয়া আসিলে পর রামের আর চিত্রকূটের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তাই তিনি সীতা আর লক্ষ্মণকে লইয়া সেখান হইতে অত্রি মুনির আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

অত্রি আর তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া দেবীর গুণের কথা কী বলিব! এমন ধার্মিক লোক অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহারা যে কত কাল যাবৎ তপস্যা করিতেছেন, তা কেহ জানে না। অনসূয়া দেবী যার-পর-নাই বুড়া হইয়াছেন, তেমন বুড়া মানুষ রাম দেখেন নাই। সীতাকে অনসূয়া দেবীর এতই ভাল লাগিল যে, তিনি তাঁহাকে বর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সীতা বলিলেন, 'মা, আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। ইহার পর আবার বর লইয়া কী হইবে?'

কিন্তু অনসূয়া কি তাহাতে ভোলেন? আর কিছু না হউক, একখানি পোশাক, কতকগুলি অলঙ্কার, একছড়া মালা, আর গায়ে মাখিবার খানিকটা অঙ্গরাগ তিনি সীতাকে না দিয়া ছাড়িলেনই না। এই সকল জিনিস যে খুব সুন্দর ছিল, সে বিষয়ে তো কিছু সন্দেহই নাই; তাহা ছাড়া ইহাদের একটি আশ্চর্য গুণ এই ছিল যে, ইহারা কোন কালেও ময়লা হইত না।

এইরূপ আদর যত্নে অত্রি মুনির আশ্রমে এক রাত্রি থাকিয়া পরদিন সীতাও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম অন্য একটি বনে চলিয়া গেলেন। সে বনের নাম দণ্ডক বন।

অরণ্যকাণ্ড

দণ্ডক বনে অনেক মুনির আশ্রম ছিল। সেই সকল আশ্রমের মধ্যে এক রাত্রি থাকিয়া রাম সেখান হইতে আরও গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। বনবাসে আসিয়া অবধি এতদিনে তাঁহারা কোন রাক্ষস দেখিতে পান নাই। এই বার বেশ জমকালো রকমের একটা রাক্ষস তাঁহাদের সামনে পড়িল। বনের ভিতর সে দাঁড়াইয়া আছে, যে এটা পাহাড়! চেহারার কথা আর কী বলিব! যেমন বিষম ভুঁড়ি, তেমনি বিদঘুটে হাঁ! তাহার উপর আবার গর্তপানা দুটো চোখ, গণ্ডারের চামড়ার মত চামড়া, আর পরনে রক্ত চর্বি-মাখা বাঘছাল।

রাক্ষস মহাশয়ের তখন জলখাবার খাওয়া হইতেছিল। খাওয়ার আয়োজন বেশি নয়-গোটা তিনেক সিংহ, চারিটা বাঘ, দুটা গণ্ডার, দশটা হরিণ, আর একটা হাতির মাথা!

সে জলযোগে কাহারও কোন আপত্তি ছিল না, যদি হতভাগা সীতাকে লইয়া ছুট না দিত। সীতাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া রাম 'হায় হায়!' করিয়া কাঁদিতে লাগলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, তুমি এত বড় বীর, তুমি কেন এমন করিয়া কাঁদিতেছ? এই দেখ, আমি রাক্ষস মারিয়া দিতেছি।'

তাহা শুনিয়া রাক্ষস বলিল, 'তোরা কে রে?' রাম বলিলেন, 'আমরা ক্ষত্রিয়। তুই কে?' রাক্ষস বলিল, 'আমার নাম বিরাধ; ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, অস্ত্র দিয়া কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না। তোরা শীঘ্র পালা।'

একথা শুনিয়া রাম বিরাধের গায়ে সাত বাণ মারিলেন। তখন সে সীতাকে ফেলিয়া, শূল হাতে বিকট শব্দে, হাঁ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে খাইতে আসিল। রাম লক্ষ্মণ যত বাণ মারেন, ব্রহ্মার বরে তাহাতে তাহার কিছুই হয় না; সে গা-ঝাড়া দিয়া সব ফেলিয়া দেয়। এমন সময় রামের দুই বাণে তাহার শূলটা কাটা গেল। তারপরে দুই জনে খড়গ লইয়া যেই তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন, অমনি সে দুহাতে দুইজনকে কাঁধে ফেলিয়া দে ছুট।

তখন সীতা ভয়ানক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ওগো রাক্ষস, তুমি ইহাদিগকে চাড়িয়া আমাকে খাও!' যাহা হউক, রাক্ষসের কাহাকেও খাইবার দরকার হইল না। কারণ, রাম লক্ষ্মণ তখনই তাহার দুই হাত ভাঙিয়া দিলেন, আর তাহাতে সে 'ভেউ ভেউ' করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

কিন্তু কী মুস্কিল! সে আপদ কিছুতেই মরিতে চায় না। দুইজনে তাহাকে কিল, লাথি, আছাড়, কত মারিলেন, মাটিতে ফেলিয়া থেতলা করিয়া দিলেন, খড়গ দিয়া কাটিতে গেলেন, কিছুতেই তাহার মরণ নাই! তখন রাম বলিলেন, 'দেখ লক্ষ্মণ, এটা অস্ত্রে মরিবে না। চল এটাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলি।' এই কথা বলিয়া রাম সেই রাক্ষসের গলাটা পায়ে চাপিয়া ধরিলেন।

তখন রাক্ষস বলিতে লাগিল, 'বুঝিয়াছি, আপনারা রাম লক্ষ্মণ। আমি তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব ছিলাম, কুবেরের শাপে রাক্ষস হইয়াছি। কুবের আমাকে শাপ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, দশরথের পুত্র রাম যুদ্ধ করিয়া আমাকে মারিলে, আমি আবার গন্ধর্ব হইয়া স্বর্গে যাইব।' এইরূপে নিজের পরিচয় দিয়া রাক্ষস বলিল, 'এখান হইতে দেড় যোজন দূরে শরভঙ্গ মুনি থাকেন। সেখানে গেলে আপনাদের ভাল হইবে।'

এরপর একটা গর্ত খুঁড়িয়া বিরাধকে পুঁতিলেই হয়। গর্ত খুঁড়িতে লক্ষ্মণের অধিক কষ্ট হইল না, কিন্তু পুঁতিবার সময় বিরাধ বড়ই চ্যাচাইয়াছিল।

তারপর তিনজনে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গেলেন। রামকে দেখিতে শরভঙ্গের বড়ই ইচ্ছা। ইন্দ্র তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসেন, কিন্তু রামকে না দেখিয়া তিনি সেখানে যাইতে চাহেন নাই। রাম যে আসিবেন তাহা তিনি আগেই জানিতেন, আর শুধু তাঁহাকে দেখিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রামকে দেখা যখন হইয়া গেল, তখন আর এই পৃথিবীতে তাঁহার প্রয়োজন রহিল না। সুতরাং তিনি তখন রামের সম্মুখে নিজ হাতে আগুন জ্বালিয়া, তাঁহার ভিতরে গিয়া বসিলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে তাঁহার

সেই পুরাতন রোগা পাকা-চুল-দাড়ি-ওয়ালা শরীর পুড়িয়া গিয়া, তাহার বদলে অতি সুন্দর আর উজ্জ্বল একটি বালকের মত চেহারা হইল। তখন তিনি রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, এখান হইতে তোমরা সুতীক্ষ্ম মুনির আশ্রমে যাইও, তাহাতে তোমাদের উপকার হইবে।' এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

শরভঙ্গ মুনি স্বর্গে চলিয়া গেলে পর অন্য অনেক মুনি দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের নিকট রাম জানিতে পারিলেন যে, রাক্ষসেরা তাঁদের উপর বড়ই অত্যাচার করে। তাহা শুনিয়া রাম বলিলেন, 'আপনাদের ভয় নাই, আমি রাক্ষস দূর করিয়া দিব।'

তারপর রাম লক্ষ্মণ আর সীতা সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গেলেন। সুতীক্ষ্ণের ইচ্ছা ছিল যে, রাম আর অন্য কোথাও না গিয়া তাঁহার আশ্রমেই থাকেন। কিন্তু দণ্ডক বনের অন্যান্য মুনিদের সহিত দেখা করিতে রামের নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা তবে যাও, কিন্তু দেখা হইয়া গেলে আবার আমার এখানে আসিবে।' রাম লক্ষ্মণ তাহাতে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর দশ বৎসর ধরিয়া রাম লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যের তপোবন সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে মুনির নিকটেই যান, তিনিই তাঁহাদিগকে কিছুদিন না রাখিয়া ছাড়েন না। কোথাও মাসেক, কোথাও চার-পাঁচমাস, কোথাও এক বৎসর, এইরূপ দশ বৎসর মুনিদের আশ্রমে আশ্রমে কাটাইয়া, শেষে তাঁহারা আবার সুতীক্ষ্ণের নিকটে আসিয়া কিছুদিন রহিলেন।

সকল মুনির সহিতই দেখা হইল, কিন্তু অগস্ত্য মুনির সহিত দেখা এখনও হয় নাই। রাম ভাবিলেন যে, এখন একবার তাঁহার সহিত দেখা করিলে বড় ভাল হয়। তাই তাঁহারা সুতীক্ষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া অগস্ত্যের আশ্রমে গেলেন।

মুনিদের মধ্যে অগস্ত্য একজন অতিশয় বড় লোক। তাঁহার এক একটা কাজ বড়ই আশ্চর্য। একবার তিনি চুমুক দিয়া সমুদ্রটাকে খাইয়া ফেলেন। ইল্বল আর বাতাপি নামক দুইটা দৈত্যকে তিনি যেমন করিয়া মারেন, তাহা অতি চমৎকার।

ইল্বল আর বাতাপি দুই ভাই ছিল। ইহাদের কাজ ছিল কেবল ব্রাহ্মণ মারিয়া খাওয়া। ইল্বল ব্রাহ্মণ সাজিয়া, সংস্কৃত কথা আওড়াইতে আওড়াইতে

ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইত। কোন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেই বলিত, 'আমার বাড়িতে শ্রাদ্ধ, আপনার নিমন্ত্রণ।' শ্রাদ্ধের কথা একেবারেই মিথ্যা। আসলে ফাঁকি দিয়া ব্রাহ্মণ বেচারাকে নিজের বাড়িতে আনা চাই।

দুরাত্মা, সেই ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া আনিয়া ভেড়া খাইতে দিত। সে আবার যে-সে বেড়াও নয়, তাহার ভাই বাতাপি সেই ভেড়া সাজিত। সেই ভেড়ার মাংস রাঁধিয়া সে ব্রাহ্মণকে খাইতে দিত, আর খাওয়া হইলে ডাকিত, 'বাতিপ, বাতাপি!' বাতাপি তখন ভেড়ার মত 'ভ্যা ভ্যা' করিতে করিতে বেচারা ব্রাহ্মণের পেট চিরিয়া বাহির হইত। এইরূপে তাহারা অনেক ব্রাহ্মণ মারিয়াছিল।

এই দুই দৈত্যকে শাস্তি দিবার জন্য অগস্ত্র মুনি একবার তাহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন। ইল্বল তাঁহাকেও সেইরকম করিয়া বেড়া রাঁধিয়া খাওয়াইল। সে জানিত না যে, এই সর্বনেশে মুনি তাহার ভাইকে একেবারে হজম করিয়া ফেলিবেন! খাওয়া শেষে ইল্ভবল ডাকিল 'বাতাপি বাতাপি!' অগস্ত্য বলিলেন, 'বাতাপি কোথা হইতে আসিবে? তাহাকে যে হজম করিয়া ফেলিয়াছি!' তাহা শুনিয়া ইল্বল অগস্ত্যকে মারিতে গেল, কিন্তু অগস্ত্য কেবল তাহার দিকে রাগের ভরে তাকাইয়াই তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

অগস্ত্য রামকে বিশ্বকর্মার তৈয়ারি একখানি ধনুক, ব্রহ্মদত্ত নামে একটা ভয়ঙ্কর বাণ, অক্ষয় তূণ নামক একটি তূণ, আর একখানি আশ্চর্য খড়গ দিলেন। তূণটির এমন আশ্চর্য গুণ ছিল যে, তাহার ভিতরকার তীর কিছুতেই ফুরাইত না; এইজন্য তাহার নাম অক্ষয় তূণ। রাম সেই জিনিসগুলি লইয়া অগস্ত্যকে বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আমাদিগকে একটি সুন্দর জায়গা দেখাইয়া দিন, আমরা সেখানে ঘর বাঁধিয়া থাকিব।' অগস্ত্য একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'এখান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামে একটি অতি সুন্দর বন আছে। সেখানে সুন্দর ফলমূল, মিষ্ট জল, হরিণ, ময়ূর ইত্যাদি সকলই পাওয়া যায়। তোমরা সেইখানে গিয়া সুখে বাস কর। এ কথায় রাম অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটী যাত্রা করিলেন।

খানিক দূরে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, পথের ধারে বিশাল এক পাখি বসিয়া আছে। তাহাকে রাক্ষস ভাবিয়া রাম লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে হে?' সে বলিল, 'বাবা, আমি তোমাদের পিতার বন্ধু। আমার নাম জটায়ু। আমার দাদার নাম সম্পাতি, আমার পিতার নাম অরুণ। গরুড় আমাদিগের জ্যেঠামহাশয়।'

পাখি আরও বলিল, 'তোমরা আমার সঙ্গে এইখানে থাক; তাহা হইলে তোমরা যখন ফল আনিতে যাইবে, তখন আমি সীতাকে দেখিতে পারিব।' রাম লক্ষ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কথাবার্তা তাঁহাদের বড়ই মিষ্ট লাগিল।

সে স্থানটি বাস্তবিকই খুব সুন্দর। কাছেই গোদাবরী নদী। তাহাতে হাঁস সারস প্রভৃতি নানারকমের পাখি খেলা করিতেছে। দুই ধারে সুন্দর পাহাড়গুলি ফুলে ফুলে বোঝাই হইয়া আছে। নদীতে হরিণ জল খাইতে আসে, আর বনের ভিতর ময়ূর ডাকে। ঘর বাঁধিয়া থাকিবার পক্ষে চমৎকার! এই সুন্দর স্থানে লক্ষ্মণ একটি সুন্দর ঘর বাঁধিলেন।

সেই ঘরটিতে তিনজনের বেশ সুখেই সময় কাটিতেছিল। কিন্তু সুখ কি চিরদিন থাকে? একদিন সূর্পণখা নামে একটা রাক্ষসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, 'আমি রাবণ রাজার বোন। রামকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি।' রাম তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না। তখন সে লক্ষ্মণকে বলিল, 'তুমি আমাকে বিবাহ কর।' লক্ষ্মণও রাজি হইলেন না। তাহাতে সে হতভাগী হাঁ করিয়া সীতাকে খাইতে গেল। এত বাড়াবাড়ি করিলে কে সহ্য করিতে পারে? কাজেই তখন লক্ষ্মণ খড়গ দিয়া তাহার নাক আর কান কাটিয়া দিলেন। সেই রক্তমাখা নাক কান লইয়া রাক্ষসী হাত তুলিয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে বনের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

কাছেই জনস্থান বলিয়া একটা জায়গা। সেখানে সূর্পণখার আর এক ভাই থাকে, তাহার নাম খর। সূর্পণখা কাটা নাক কান লইয়া, সেই খরের সম্মুখে গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। ভগ্নীর নাক কান কাটা দেখিয়া খর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'একি সর্বনাশ! হায় হায় ! কিসে তোমার এইরূপ হইল? তুমি কেমন সুন্দর ছিলে। যমের মত তোমার ভয়ানক চেহারা, আর গর্তপানা চোখ ছিল। কোন্ দুষ্ট তোমার এমন দশা করিল, শীঘ্র বল। তাহাকে এখনি উচিত সাজা দিতেছি।'

সূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'দশরথ রাজার দুটা ছেলে আসিয়াছে, তাহাদের নাম রাম আর লক্ষ্মণ। তাহারাই আমার এই দশা করিয়াছে। আমার কোন দোষ নাই, দাদা। আজ আমাকে তাহাদের রক্ত আনিয়া খাইতে দিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া খর তখনই চৌদ্দটা রাক্ষসকে হুকুম দিল, 'তোমরা এখনই সেই তিনটা মানুষকে মাররিয়া নিয়া আস, সূর্পণখা তাহাদের রক্ত খাইবেন।' সেই হুকুম পাওয়ামাত্রই চৌদ্দটা রাক্ষস অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিল। সূর্পণখা তাহাদের সঙ্গে গিয়া রাম লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল।

এদিকে রামও সীতাকে লক্ষ্মণের নিকট রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। চৌদ্দটা রাক্ষস বিষম রাগে তাঁহার উপর চৌদ্দটা শূল ছুঁড়িয়া মারিল। রাম চৌদ্দ বাণে সেই চৌদ্দটা শূলকে কাটিয়া, নারাচ অস্ত্রে একেবারে রাক্ষসদিগের বুক ফুটা করিয়া দিলেন। সে অস্ত্র তাহাদের পিঠ দিয়া বাহির হইয়া, মাটির ভিতরে অবধি ঢুকিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সূর্পণখাও তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইল।

সূর্পণখাকে আবার ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া খর বলিল, 'আবার কি হইয়াছে? তোমার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা কি সেই মানুষ তিনটাকে মারিতে পারে নাই?' সূর্পণখা বলিল, 'না, রামই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তুমি নিজে চল।' এই বলিয়া সে পেট চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, ঘোরতর শব্দে কাঁদিতে লাগিল।

তখন খর নিজেই তাহার ভাই দূষণকে লইয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে চলিল। চৌদ্দ হাজার রাক্ষস শেল, শূল, মুষল, মুদগর পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, তোমর, গদা, শক্তি, কুড়াল, খড়গ প্রভৃতি লইয়া গর্জন করিতে করিতে তাহাদের সঙ্গে চলিল। আকাশে দেবতারা ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন, এবার কী ভয়ানক যুদ্ধ হয়!

এদিকে রামও সীতাকে লক্ষ্মণের সঙ্গে একটা পর্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছেন। রাক্ষসেরা গর্জন করিতে করিতে আসিয়া রামের উপর প্রাণপণে অস্ত্র ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু রাম এমনই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে পারিল না। রামের বাণে তাহাদের হাতি, ঘোড়া, লোকজন যত ছিল, সকলই একেবারে খণ্ড-খন্ড হইয়া গেল।

-তখন খরের ভাই দূষণ বড়ই রাগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সে যে কেমন যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা আর বলিয়া কী হইবে। প্রথমেই তো রামের বাণে তাহার ঘোড়া গেল, সারথি গেল, ধনুক গেল। তখন সে লইল একটা পরিঘ। অমনি সেই পরিঘ-শুদ্ধ তাহার হাত দুটা কাটা গেল। তখন বেচারা মরিয়া গেল। তারপর আর তিনটা রাক্ষস আসিয়া ভালমতে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে না করিতেই মরিয়া গেল।

একলা রাম যুদ্ধ করিয়া চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে মারিলেন। অবশিষ্ট রহিল কেবল খর আর তাহার পুত্র ত্রিশিরা। ত্রিশিরা অতি অল্পক্ষণই যুদ্ধ করিয়াছিল, শেষে রহিল শুধু খর।

খর ভয়ানক যুদ্ধ জানিত। সে প্রথমে খুব তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া রামের ধনুক আর বর্ম কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু রাম তখনই সেই অগস্ত্য মুনির ধনুকখানি লইয়া, ক্রমে তাহার রথ, সারথি, গোড়া, ধনুক সব চুরমার করিয়া দিলেন। তখন খরের এক গদা মাত্র বাকি, তাহাও কাটিতে রামের অধিক সময় লাগিল না। গদা কাটা গেলে খরের হাতে আর একখানিও অস্ত্র রহিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার তেজ যে কিছুমাত্র কমিল, তাহা নহে। অস্ত্র ফুরাইলে সে শালগাছ লইয়া যুদ্ধ করিল। শালগাছ কাটা গেলে, শুধু হাতেই মারিতে আসিল। শেষে রাম তাহার বুকে এক বাণ মারিয়া তাহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন।

জনস্থানের যত রাক্ষস প্রায় সকলকেই রাম মারিয়া শেষ করিলেন। বাকি রহিল খালি অকম্পন নামে একটা। অকম্পন পলাইয়া লঙ্কায় গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, জনস্থানে যত রাক্ষস ছিল, সকলই মরিয়া গিয়াছে। কেবল আমিই অনেক কষ্টে পলাইয়া আসিয়াছি।' তাহা শুনিয়া রাবণ আশ্চর্য হইয়া বলির, 'সে কী কথা, অকম্পন! তাহারা কী করিয়া মরিল?

অকম্পন বলিল, 'মহারাজ, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম তাহাদিগকে মারিয়াছে। রাম যে কত বড় বীর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে একাই জনস্থান নষ্ট করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আবার তাহার এক ভাই আছে, সেটার নাম লক্ষ্মণ।

এ কথা শুনিয়া রাবণের রাগের আর সীমা রহিল না। সে তখনই রাম লক্ষ্মণকে মারিবার জন্য জনস্থানে যাইতে চাহিল। কিন্তু অকম্পন তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, 'মহারাজ কি রামকে যেমন-তেমন বীর ভাবিয়াছেন? আপনার সমস্ত রাক্ষস লইয়া গেলেও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পারিবেন না। তবে, তাহাকে মারিবার একটা উপায় আছে। রাম তাহার স্ত্রী সীতাকে আনিয়াছে। সীতা এতই সুন্দর যে, তেমন আর কেহ দেখে নাই। আপনি যদি রামকে ফাঁকি দিয়া এই সীতাকে ধরিয়া আনিতে পারেন, তবে সেই দুঃখে রাম আপনিই মরিয়া যাইবে।' তাহা শুনিয়া রাবণ বলিল, 'আমি আজই যাইতেছি।'

এই বলিয়া সে তাহার গাধায় টানা ঝকঝকে রথখানিতে চড়িয়া, তাড়কার পুত্র মারীচের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। মারীচ তাহাকে দেখিয়া বলিল,

'মহারাজ যে এমন তাড়াতাড়ি করিয়া একলাটি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! ব্যাপারখানা কী?'

রাবণ বলিল, 'দশরথের ছেলে রাম জনস্থানের রাক্ষসদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমি তাহার স্ত্রী সীতাকে ধরিয়া আনিতে যাইতেছি।' মারীচ বলিল, 'মহারাজ, এরূপ বুদ্ধি আপনাকে কে দিয়াছে? আপনি এইবেলা লঙ্কায় ফিরিয়া যাউন। রামের হাতে পড়িলে আপনার আর রক্ষা থাকিবে না।'

তাহা শুনিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, সম্মুখে সূর্পণখা, তাহার নাক কান কাটা। জনস্থানে রাক্ষসেরা মারা গেলে পর হতভাগী চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে লঙ্কায় চলিয়া আসিয়াছে।

সূর্পণখার কথা শুনিয়া রাবণ আবার মারীচের কাছে ফিরিয়া গেল। এবারে আর সে তাহার কোন কথাই শুনিল না। সে বলিল, 'মারীচ, আমার এ কাজটি করিয়া না দিলেই নয়। তুমি রামের আশ্রমে গিয়া, সোনার হরিণ সাজিয়া সীতার সম্মুখে নাচিয়া বেড়াইবে। তোমাকে দেখিলে নিশ্চয় সীতা তোমাকে ধরিবার জন্য রাম লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিবে। রাম লক্ষ্মণ আশ্রমের বাহিরে চলিয়া গেলে আর সীতাকে ধরিয়া আনিতে কিসের ভয়!'

মারীচ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হাতে বলিল, 'মহারাজ, এক সময় আমার গায় হাজার হাতির জোর ছিল। আমি মনের সুখে দণ্ডকবনের মুনিদিগকে ধরিয়া খাইতাম, আর তাহাদের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া বেড়াইতাম। আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নষ্ট করিতে গেলাম আর এই রাম ধনুক লইয়া আমাকে আটকাইতে আসিল। তখন সে ছোট্ট ছেলেমানুষ ছিল। আমি মনে করিলাম, ঐটুকু মানুষ আমার কী করিবে! কিন্তু সেই ঐটুকু মানুষই এমন এক বাণ আমাকে মারিল যে, আমি তাহার চোটে অজ্ঞান হইয়া এক সমুদ্রের জলে আসিয়া পড়িলাম। এমন লোকের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে যাইতে হয়? তাহার তো কিছু করিতে পারিবেনই না, মাঝখান হইতে আপনার প্রাণটি যাইবে!'

ঔষধ তিক্ত হইলে যেমন তাহা খাইতে ভাল লাগে না, মারীচের কথাও রাবণের কাছে সেইরূপ ভাল লাগিল না। সে বলিল, 'এ কাজ তোমায় করিতেই হইবে। সোনার হরিণ, তাহার গায়ে রূপার চক্র, এমনি সাজ ধরিয়া তুমি সীতার সামনে গিয়া খেলা করিতে থাক। এমন হরিণটি দেখিলেই সীতা ভুলিয়া যাইবে, আর তোমাকে ধরিবার জন্য রামকে না পাঠাইয়া থাকিতেই পারিবে না। রাম তোমার পিছনে পিছনে অনেক দূর আসিলে পর, তুমি রামের মতন গলায়

চ্যাঁচাইবে, "হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!" সে শব্দ শুনিলে, লক্ষ্মণ কি আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিবে? তাহাতে আশ্রম ছাড়িয়া রামের কাছে আসিতেই হইবে। তখন আর সীতাকে কে রাখে? মারীচ, এ কাজটি করিয়া দিলে আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার। আর যদি না কর, তবে এখনি তোমার মরণ!'

কাজেই তখন আর বেচারা কী করে? রাবণের সেই রথে চড়িয়া তাহাকে আসিতে হইল। সীতা তখন সাজি হাতে করিয়া ফুল তুলিতেছিলেন। এমন সময় সেই দুষ্ট রাক্ষস সোনার হরিণ সাজিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সীতা রাম লক্ষ্মণকে ডাকিলেন।

সোনার হরিণ দেখিয়াই লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, হরিণ কি কখনও সোনার হয়? এটা নিশ্চয় সেই তাড়কার ছেলে মারীচের ফাঁকি! ঐ দুষ্ট অনেক সময় হরিণের সাজ ধরিয়া মুনিদিগকে মারিতে আসে।'

কিন্তু সীতা সেই হরিণ দেখিয়া এতই ভুলিয়া গেলেন যে, লক্ষ্মণের কথা তাঁহার কানেই গেল না। তিনি রামকে বলিলেন, 'কী সুন্দর হরিণ! ওটি আমাকে ধরিয়া দিতেই হইবে! জীবন্ত ধরিতে পারিলে আমরা উহাকে পুষিব, আর দেশে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব! জীবন্ত ধরিতে পারিলে আমরা উহাকে পুষিব, আর দেশে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব! আর জীবন্ত ধরিতে না পরিলেও, উহার চামড়ায় সুন্দর আসন হইবে!'

লক্ষ্মণকে সাবধানে পাহারা দিতে বলিয়া রাম হরিণ ধরিতে চলিলেন। দুষ্ট রাক্ষস কতই ছল জানে! এক এক বার কাছে আসে, আবার বনের ভিতরে লুকায়, আবার খানিক দূর গিয়া গাছের আড়াল হইতে ডাক মারে। এইরূপ করিয়া সে তাঁহাকে অনেক দূর লইয়া গেল। রাম যতক্ষণ মনে করিয়াছিলেন। যে তাহাকে ধরিতে পারিবেন, ততক্ষণ ক্রমাগত তাহার পিছু-পিছু ছুটিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে আশ্রম হইতে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছেন, তবুও তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি একটা তীর ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সেই তীরের ঘায় রাক্ষসের হরিণের সাজ ঘুচিয়া গেল। এখন তাহার প্রাণ যায় -যায়। মরিবার সময় সে বিকট রাক্ষস হইয়া ঠিক রামেরই মতন স্বরে 'হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন যে সর্বনাশ হইয়াছে! এ শব্দ সীতার কানে গেলে কী আর রক্ষা থাকিবে? এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্যস্ত হইয়া আশ্রমের দিকে ফিরিলেন।

এদিকে সীতা আশ্রম হইতে সেই দুষ্ট রাক্ষসের কান্না শুনিতে পাইয়া রামের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'হায় হায়! না জানি কী সর্বনাশ হইল! লক্ষ্মণ, শীঘ্র যাও! নিশ্চয় তিনি রাক্ষসের হাতে পড়িয়াছেন!'

কিন্তু লক্ষ্মণকে রাম সীতার নিকট থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন, কাজেই তিনি সীতাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। তখন সীতা লক্ষ্মণকে এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন, 'বুঝিয়াছি, তাঁহাকে রাক্ষসে মারিয়া ফেলে, ইহাই তুমি চাও। এমন ভাই তুমি!'

তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদাকে মারিতে পারে, ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই। আপনি কেন আমাকে এইরূপ করিয়া বলিতেছেন? আপনাকে একলা ফেলিয়া যাওয়া কি আমার উচিত? আপনার কোন ভয় নাই। যে শব্দ শুনিয়াছেন, উহা রাক্ষসের ফাঁকি। রাক্ষসদিগের সঙ্গে আমাদের এখন শত্রুতা, সুতরাং তাহারা আমাদের অনিষ্ট করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিবে। আপনি দুঃখ করিবেন না, স্থির হউন।'

কিন্তু সীতা আরও রাগিয়া বলিলেন, 'তবে রে নিষ্ঠুর দুষ্ট লক্ষ্মণ, রামের বিপদ হইলেই বুঝি তোর সুখ হয়? তোর মতন পাপী তো আর নাই! তোকে বুঝি ভরত পাঠাইয়াছে? না তুই নিজেই দুষ্টবুদ্ধি আঁটিয়া রামের সঙ্গে আসিয়াছিস?'

এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের মনে যে কী কষ্ট হইল , তাহা কী বলিব! তিনি বলিলেন, 'আপনাকে আমি মায়ের মতন ভক্তি করি। কিন্তু আপনি এমন শক্ত কথা আমাকে বলিতেছেন যে, আমার তাহা কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। যাহা হউক, এই আমি চলিলাম, বনের দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন! সাবধান হইয়া ঘরে বসিয়া থাকুন, যেন দাদার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া আবার আপনাকে দেখিতে পাই।' এই বলিয়া লক্ষ্মণ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বার বার ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলেন, পাছে সীতার কোন অনিষ্ট হয়।

লক্ষ্মণ চলিয়া যাওয়া-মাত্রই সন্ন্যাসীর বেশে রাবণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে ছাতা লাঠি আর কমণ্ডুল, মাথায় টিকি, পায়ে জুতা, কপালে লম্বা ফোঁটা, মুখে ঘন-ঘন হরিনাম। দুষ্ট ক্রমে ঘরের দরজায় আসিয়া সীতার সহিত কথাবার্তা জুড়িয়া দিল। সীতা মনে করিলেন, বুঝি সে যথার্থই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী। কাজেই তিনি তাহাকে নমস্কার করিয়া, বসিবার জন্য কুশাসন আর পা ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিলেন। তারপর তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, ফলমূল আনিয়া দিই, দয়া করিয়া কিছু আহার করুন।'

রাবণ এইরূপে সীতার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া শেষে বলিল, 'আমি লঙ্কার রাজা রাবণ। তুমি বনে থাকিয়া, এই তপস্বীটার সঙ্গে মিছামিছি এ কষ্ট কেন করিতেছ? আমার সঙ্গে লঙ্কায় চল। সেখানে তুমি যার পর-নাই সুখে থাকিবে।'

এই কথা শুনিয়া সীতা ভয়ানক রাগের সহিত বলিলেন, 'বটে রে দুষ্ট, তোর এত বড় কথা! এর উচিত সাজা তুই এখনি পাইবি।'

তখন রাবণ সন্ন্যাসীর সাজ ফেলিয়া তাহার নিজের চেহারায় দাঁড়াইল। সে যে কী বিকট মূর্তি, তাহা কী বলিব! দশটা মাথা, কুড়িটা হাত, কুড়িটা চোখ-দেখিলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। এইরূপ চেহারা করিয়া সে সীতাকে বলিল, 'তুমি বুঝি পাগল, তাই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? রামের মায়া ছাড়িয়া দাও। সেটা হতভাগা, তাহাকে ভালবাসা কি তোমার উচিত?'

এই কথা বলিতে বলিতেই রাবণের রথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণও সীতার চুল ধরিয়া তাঁহাকে সেই রথে নিয়া তুলিতে আর বিলম্ব করিল না। সীতা রামের নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া কতই কাঁদিলেন, তাঁহার শরীরে যেটুকু জোর ছিল, তাহা লইয়াই প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইবার জন্য কতই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই ভয়ানক রাক্ষসের সঙ্গে তিনি পারিবেন কেন? রথ তাঁহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়া চলিল। সীতা পশু পক্ষীকে, বনদেবতাদিগকে, গোদাবরী নদীকে ডাকিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওগো, তোমরা দয়া করিয়া রামকে সংবাদ দাও। তাঁহার সীতাকে দুষ্ট রাবণ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে।

সে সময়ে বুড়া জটায়ু পক্ষী গাছে বসিয়া ঘুমাইতেছিল। সীতার কান্নার শব্দে সে জাগিয়া দেখিল যে রাবণ তাঁহাকে লইয়া পলাইতেছে। তাহা দেখিয়া জটায়ু বলিল, 'বটে রে দুষ্ট রাক্ষস, আমি এখানে থাকিতেই তুই সীতাকে লইয়া পলাইবি? এখনই নখ দিয়া তোর মাথা ছিঁড়িয়া দিতেছি!'

তখন জটায়ু আর রাবণে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাবণ জটায়ুকে ভয়ানক ভয়ানক বাণ মারে, আর জটায়ু নখের আঁচড়ে তাহার মাংস ছিঁড়িয়া নিতে ছাড়ে না। রাবণ জটায়ুর বুকে দশ বাণ মারিয়া মনে করিল, এইবার পাখি মরিবে। কিন্তু পাখি মরা দূরে থাকুক, বরং সে রাবণের ধনুকটা কাড়িয়া লইল, তাহার উপর আবার তাহাকে একটা প্রকাণ্ড লাথিও মারিল। তারপর রাবণ আবার নতুন ধনুক লইয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি বাণ মারিল বটে, কিন্তু জটায়ু কি তাহাতে ডরায়? বাণ তো তাহার ডানার বাতাসেই উড়িয়া গেল। তারপর ধনুকখানি কাড়িয়া লইয়া তাহা মাড়াইয়া গুড়া করিতে কতক্ষণ লাগে।

এমনিতর ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া জটায়ু রাবণের রথ, ছাতা, সারথি, সহিস কিছুই আস্ত রাখিল না। কিন্তু সেই বুড়া বয়সে আর কত যুদ্ধ করিবে? সে শীঘ্রই কাহিল হইয়া পড়িল।

রাবণ দেখিল যে এই বেলা পলাইবার উত্তম সময়। সুতরাং সে হাতে একখানি খগড় আর বগলে সীতাকে লইয়া চুপি-চুপি চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া জটায়ু অমনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'দাঁড়া পাপী, যাইতেছিস কোথায়?' এই বলিয়া হাতির পিঠে যেমন মাহুত চড়ে, সেইরূপ জটায়ু গিয়া রাবণের পিঠে চড়িল। তারপর তাহাকে ঠোকরাইয়া, আঁচড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া এমনি নাকাল করিল যে নাকাল যাহাকে বলে!

কিন্তু রাবণ সহজে মরিবার লোক ছিল না। ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে, তাহার শরীরের কোন জায়গা ছিঁড়িয়া গেলে তাহা তখনই জোড়া লাগিবে। জটায়ু তাহার বাম দিকের দশটা হাত ছিঁড়িয়া গেলে তাহা তখনই জোড়া লাগিবে। জটায়ু তাহার বাম দিকের দশটা হাত ছিঁড়িয়া ফেলিতে না ফেলিতেই দেখিল যে, তাহার আর দশটা হাত বাহির হইয়াছে। এরূপ লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? কাজেই শেষটা জটায়ু আর পারিল না। তখন সেই দুষ্ট রাক্ষস খড়গ দিয়া বেচারার পা আর ডানা দুখানি কাটিয়া ফেলিল। জটায়ুর তখন প্রাণ যায়-যায়। এরপর আর সীতাকে কে রক্ষা করিবে? কাজেই তখন রাবণ তাঁহকে লইয়া শূন্যে চলিয়া গেল।

সীতার দুঃখের কথা আর কী বলিব! হায় হায়! তাঁহার সেই কান্না কেহই শুনিতে পাইল না। সেই শুন্যের উপর হইতে সীতা এমন একটি লোক দেখিতে পাইলেন না, যাহাকে ডাকিয়া বলিতে পারেন, 'আমাকে রক্ষা কর'। তিনি কেবল দেখিলেন যে, একটা পর্বতের উপর পাঁচটি বানর রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি তাঁহার সোনালী রঙের চাদরখানি আর গায়ের গহনাগুলি ফেলিয়া দিলেন। মনে করিলেন, হয়ত তাহা দেখিতে পাইয়া তাহারা রামকে বলিবে। রাবণ ইহার টের পাইল না, কিন্তু বানরেরা তাহা চাহিয়া দেখিল।

এদিকে রাম সেই হরিণের সাজ-ধরা রাক্ষসটাকে মারিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতেছেন, তাঁহার মনে ভয়ের আর সীমা নাই। এমন সময় দেখিলেন, লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিতভাবে সেই দিক দিয়া আসিতেছেন। লক্ষ্মণকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'সেকি লক্ষ্মণ, তুমি সীতাকে ফেলিয়া আসিয়াছ? না জানি কী সর্বনাশ হইয়াছে! সীতাকে হয়ত আর দেখিতে পাইব না!'

এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, সীতা নাই, খালি ঘর পড়িয়া রহিয়াছে। সীতা যে-সকল জায়গায় বেড়াইতেন, তাহার কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না।

হায় হায়! সীতা কোথায় গেলেন? তিনি কি কোথাও লুকাইয়া আছেন? না বনে ফুল তুলিতে গিয়াছেন? না নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন? কোথায় তিনি? গাছতলায়, নদীর ধারে, পাহাড়ের উপরে, কত জায়গায় রাম সীতাকে খুঁজিলেন, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। গাছকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাখিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিণগুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই সীতার সংবাদ বলিতে পারিল না।

তখন তিনি হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'হায় রে লক্ষ্মণ, কে আমাদের সীতাকে লইয়া গেল? সীতা, তুমি বুঝি লুকাইয়া থাকিয়া তামাসা দেখিতেছ? শীঘ্র আইস, আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। তুমি চলিয়া গেলে যে আমি আর বাঁচিব না!'

লক্ষ্মণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দাদা, চল আরও ভাল করিয়া খুঁজি, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে পাইব।' কিন্তু রাম তবুও 'সীতা, সীতা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামও কাঁদেন, লক্ষ্মণও কাঁদেন, আর চারিদিকে সীতাকে খোঁজেন।

এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন, মাটিতে রাক্ষসের পায়ের দাগ রহিয়াছে, মাঝে মাঝে সীতারও পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা ভাঙা রথ আর একটা ধনুক বাণের টুকরাও সেখানে পড়িয়া আছে।

এ-সকল পায়ের চিহ্ন কাহার? এত বড় পা রাক্ষস ভিন্ন আর কাহার হইবে? নিশ্চয় সীতাকে রাক্ষসে লইয়া গিয়াছে, না হয় মারিয়া খাইয়াছে!

এইরূপ ভাবিয়া রাম বলিলেন, 'আমার সীতাকে রাক্ষসে লইয়া গেল, আর দেবতারা বারণ করিলেন না! আজ যদি আমার সীতাকে তাঁহারা না আনিয়া দেন, তবে আমি সকল সৃষ্টি নষ্ট করিব।' লক্ষ্মণ তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'দাদা, রাগ করিও না। চল এখন ভাবিয়া দেখি, এ কাজ কে করিয়াছে। সেই দুষ্টকে শাস্তি দিতেই হইবে।'

লক্ষ্মণের কথায় রাম একটু শান্ত হইলেন। তারপর তাঁহারা বনের বিতর খুঁজিতে খুঁজিতে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, জটায়ু রক্তমাখা শরীরে পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'এই দুষ্টই সীতাকে খাইয়াছে! এটা পাখি

নয়, নিশ্চয় রাক্ষস! ঐ দেখ উহার বুকে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে!' এই বলিয়া রাম জটায়ুকে মারিতে গেলেন। তখন জটায়ু বলিল, 'বাবা, রাবণই আমাকে মারিয়া রাখিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না। সীতাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি তাহার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু দুষ্ট আমার পাখা কাটিয়া সীতাকে লইয়া গেল।'

এই কথা শুনিয়া রাম তীর ধনুক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, জটায়ুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জটায়ুর তখন মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কথা কহিতেও কষ্ট হয়। তথাপি সে রামকে শান্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রাণ যায় যায়, তবুও অনেক চেষ্টা করিল, যাহাতে তাঁহাকে সীতার খবর দিয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়! বেচারা কথা শেষ করিবার সময় পাইল না। সবে বলিয়াছিল, 'রাবণ বিশ্বশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভাই', ইহার মধ্যেই তাহার কথা আটকাইয়া গেল।

রাম তাহাকে ধরিয়া দেখেন, প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন রাজা দশরথের মতন কোনও একজন গুরুলোকের মৃত্যু হইল। আপনার লোক মরিলে যেমন করিয়া তাহাকে পোড়ায়, আর তাহার জন্য কাঁদে, জটায়ুকেও সেই রূপ করিয়া পোড়াইয়া রাম তাহার জন্য কাঁদিলেন। তারপর দুই ভাই বনে বনে, গুহায় গুহায়, সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় ভয়ানক শব্দে বন কাঁপিয়া উঠিল, রাম লক্ষ্মণ খড়গ হাতে সেই শব্দের দিকে অনেক দূর গিয়া দেখিলেন, বিষম বিকটাকার একটা রাক্ষস বসিয়া আছে। সে রকম রাক্ষসের নাম কবন্ধ। তাহার মাথা থাকে না। কী ভয়ঙ্কর জানোয়ার! যেন একটা হাত-পা-ওয়ালা কালো পর্বত! মাথা নাই, তাহার বদলে পেটটাই দাঁত খিঁচাইয়া হাঁ করিয়া আছে, আর তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা জিহ্বা লক্‌লক্ করিয়া বাহির হইতেছে। চোখ একটি বৈ নাই, কিন্তু সেই একটা চোখ আগুনের মত উজ্জ্বল। এক একটা হাত প্রায় দুই ক্রোশ লম্বা! সেই লম্বা হাত দিয়া সে সিংহ, হরিণ, হাতি যাহা পাইতেছে তাহাই ধরিয়া মুখে দিতেছে।

রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকেও সে ধরিয়া ফেলিল। লক্ষ্মণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'দাদা, এইবার বুঝি প্রাণটা যায়! কিন্তু রাম তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'ভয় কী? ব্যস্ত হইতেছ কেন?'

তখন সেই রাক্ষসটা বলিল, 'তোমরা কে হে? এখানে কী করিতে আসিয়াছ? হাতে ধনুক, বাণ, খড়্গ দেখিতেছি। গায়ে জোর আছে বলিয়া বোধহয়। আর আমারও ক্ষুধা হইয়াছে। সুতরাং তোমাদিগকে খাইব।' কিন্তু সে তাহার প্রকাণ্ড মুখ অথবা পেট, যাহাই বল হাঁ করিয়া যেই রাম লক্ষ্মণকে খাইতে যাইবে, অমনি খড়্গ দিয়া তাঁহারা তাহার হাত দুইটা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সে বেদনায় অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কে?' লক্ষ্মণ তাঁহাদের নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'তুমি কে? কবন্ধ হইলে কী করিয়া?'

রাম লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া কবন্ধ বলিল, 'আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আজ তোমাদিগকে দেখিতে পাইলাম, আর তোমরা আমার হাত কাটিলে। আমার নাম দনু। এক সময়ে আমি বড় সুন্দর ছিলাম, আর ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিলাম যে অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিব। ইহার মধ্যে একদিন আমি রাক্ষসের সাজ ধরিয়া স্থূলশিরা নামক এক মুনিকে ভয় দেখাইতে গেলাম। তাহাতে মুনি আমাকে শাপ দিলেন, 'তুই ঐরূপ হইয়াই থাক্''। শাপ দূর করিয়া দিবার জন্য আমি অনেক মিনতি করিলে, তিনি বলিলেন, "রাম যখন তোর হাত কাটিয়া তোকে পোড়াইবেন, তখন আবার তোর সুন্দর চেহারা হইবে।"

'এইরূপ করিয়া আমি রাক্ষস হইলাম। তারপর আবার একদিন আমি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলাম। তাহাতে ইন্দ্র তাঁহার বজ্র দিয়া আমাকে এমন শাস্তি দিলেন যে, আমার মাথা আর পা একেবারে পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেল। কিন্তু তবুও আমি মরিলাম না। তখন আমি এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলাম, 'হায় হায়! ব্রহ্মার বরে যে আমাকে অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! এখন আমি খাইব কী করিয়া?" ইহাতে ইন্দ্র দয়া করিয়া আমাকে এই লম্বা হাতদুটা দিলেন। ইহা দিয়াই আমি এতদিন জীবজন্তু ধরিয়া খাইতেছি। রাম, তুমি আমাকে পোড়াইয়া ফেল। তাহা হইলে আমার আবার সুন্দর শরীর হইবে।'

তারপর রাম লক্ষ্মণ প্রকাণ্ড চিতা জ্বালিয়া কবন্ধকে তাহাতে পোড়াইলেন। সেই চিতার ভিতর হইতে সুন্দর চেহারা লইয়া কবন্ধ উঠিয়া আসিল। আর ঠিক সেই সময়ে একখানা হাঁসের টানা রথও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রথে চড়িয়া কবন্ধ রামকে বলিল, 'সুগ্রীব নামে এক বানর আছে। তাহার বড় ভাই বালী তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে এখন আর চারিটি বানর সঙ্গে করিয়া পম্পা নদীর ধারে ঋষ্যমূক পর্বতে ভয়ে ভয়ে বাস

করে। সুগ্রীব যেমন বীর, তেমনি বুদ্ধিমান। তুমি তাহার সহিত বন্ধুতা কর। সে সীতার সন্ধানও করিতে পারিবে, তাঁহাকে পাইবার উপায়ও করিয়া দিবে।'

এ কথায় কবন্ধের নিকট বিদায় লইয়া রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে খুঁজিবার জন্য পম্পা নদী ও ঋষ্য মূক পর্বতের দিকে যাত্রা করিলেন।

পম্পার ধারে শবরী নামে একজন অতিশয় বুড়া তপস্বিনী বাস করিতেন। তিনি কেবল রামকে দেখিবার জন্যই এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন। রামের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন, 'রাম, তোমাকে যখন দেখিতে পাইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমি স্বর্গে যাইতে পারিব। তোমার জন্য এই ফলমূল আনিয়া রাখিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া তাহা লও।'

এইরূপে রামকে আদর করিয়া, তাঁহার সম্মুখেই তিনি নিজের শরীর আগুনে পোড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর সেই আগুনের ভিতর হইতে অতি সুন্দর বেশে বাহির হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

ম্পা নদী পার হইলে ঋষ্যমূক পর্বত। সেই ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটে বানরদিগের রাজা সুগ্রীব আর কয়েকটি বানর সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সে দেখিল যে, দুইজন মানুষ সেই দিকে আসিতেছে।

এই দুইজন অবশ্য রাম ও লক্ষ্মণ ছাড়া আর কেহ নহেন। কিন্তু সুগ্রীবের মনে সর্বদাই বালীর ভয় লাগিয়া ছিল। বালী তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, আবার কখন হয়ত তাহার লোক আসিয়া তাহাকে মারিবে। এইজন্য রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়াই সে ভাবিল, বুঝি তাঁহারাও বালীরই লোক। তাই সে সঙ্গে বানরদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'সর্বনাশ হইয়াছে, এই দুইজন নিশ্চয়ই বালীর লোক।' এই কথা শুনিয়া অন্যান্য বানরদিগের মনেও ভারি ভয় হইল।

কিন্তু উহাদিগের মধ্যে হনুমান বলিয়া একজন ছিল, সে বলিল কিসের ভয়? বালী তো ঋষ্যমূক পর্বতে আসিতেই পারে না, আর ঐ লোকদুইটির সঙ্গেও তাহাকে দেখিতেছি না।' তাহা শুনিয়া সুগ্রীব বলিল, 'ও দুইজনকে দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইতেছে। উহারা বালীর লোক হইতেও তো পারে। হনুমান, তুমি একবার গিয়া জানিয়া আইস না, উহারা কিরূপ লোক, আর কেন এখানে আসিয়াছে।'

হনুমান তখন দাড়ি গোঁফ পরিয়া একটি ভিখারী সাজিল। তারপর রাম লক্ষ্মণের কাছে গিয়া মিষ্ট কথায় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, আপনারা কে? কী জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনাদিগকে দেখিলে

যেমন তেমন লোক বলিয়া বোধহয় না! এমন সুন্দর চেহারা, হাতে চমৎকার অস্ত্র, আর শরীরে বোধ হইতেছে যেন কতই জোর! এই ঋষ্যমূক পর্বতে বানরের রাজা সুগ্রীব থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াতে তিনি মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সুগ্রীব খুব বীর, আরবড়ই ধার্মিক। তিনি আপনাদের সহিত বন্ধুতা করিতে চাহেন, এবং সেইজন্যই আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী, আমার নাম হনুমান। আমি পবনের পুত্র, জাতিতে বানর।'

হনুমানের কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'আমি সুগ্রীবকে খুঁজিতেছি, এমন সময় তাহার মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটিকে অতিশয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর বীর বলিযা বোধ হইতেছে। ইহার কথাগুলি কি মিষ্ট আর কেমন শুদ্ধ! এতক্ষণ কথা কহিল, তবুও একটা পাড়া গেঁয়ে কথা উহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। লক্ষ্মণ, তুমি ইহার সঙ্গে কথাবার্তা বল।'

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, 'আমরাও সুগ্রীবকে খুঁজিতেছি। আমরা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। ইহার নাম রাম, আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি ইহার ছোট ভাই। সৎমার ছলনায় ইনি আমাকে লইয়া বনে আসিয়াছেন। ইহার স্ত্রী সীতাদেবীও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ দুষ্ট রাক্ষস তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না। শুনিয়াছি তোমাদের রাজা সুগ্রীব খুব বুদ্ধিমান। হযত তিনি সেই রাক্ষসকে জানেন। তাই রাম তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছেন।'

হনুমান বলিল, 'সুগ্রীব অবশ্যই ইহার সহিত বন্ধুতা করিবেন, আর বানরদিগকে লইয়া সীতাকে খুঁজিবার সাহায্য করিবেন। বালীর ভয়ে তিনি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সুতরাং আপনাদের আসাতে তাঁহার ও উপকার হইতে পারে।'

তারপর হনুমান রাম লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া সুগ্রীবের নিকট লইয়া গেল। সুগ্রীব রামের পরিচয় পাইয়া বলিল, 'রাম, তুমি পৃথিবীর মধ্যে সকলের বড়, আর আমি বানর। তুমি আমার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছ, আমার কী সৌভাগ্য!'

তখনই হনুমান দুইখানি কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালিল। সেই আগুনের সম্মুখে সুগ্রীব রামের সহিত কোলাকুলি করিয়া বলিল, 'তুমি আমার বন্ধু হইলে। এখন হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমারও তাহাই ইচ্ছা হইবে। যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাতে আমারও সুখ হইবে; আর যাহাতে তোমার

দুঃখ হয়, তাহাতে আমাও দুঃখ হইবে।' এই রুপে রাম আর সুগ্রীবের বন্ধুতা হইয়া গেল। তারপর তাঁহারা গাছের পাতার বিছানায় বসিয়া নিজ-নিজ সুখ-দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন।

রাম বলিলেন, 'বন্ধু, আমি বালীকে মারিয়া তোমার ভয় দূর করিব।' সুগ্রীব বলিল, 'বন্ধু, তুমি সাহায্য করিলে আমি যে আবার রাজ্য পাইব, তাহাতে সন্দেহ কী? তোমার কষ্টও দূর করিয়া দিব। সীতা যেখানেই থাকুন, আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই করিব। কেহই তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। সেদিন এইখানা দিয়া রাবণ একটি মেয়েকে লইয়া যাইতেছিল। বোধহয় তিনিই সীতা। তিনি তোমার নাম ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া গায়ের চাদর আর গহনা ফেলিয়া গেলেন। আমরা তাহা পর্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছি, দেখিলে হয়ত চিনিতে পারিবে।'

এই বলিয়া সুগ্রীব সীতার সেই সকল অলঙ্কার আর কাপড় আনিয়া রামকে দেখাইল। সীতার গায়ের চাঁদর, তাঁহার দুইখানি নুপুর, তাঁহার কেয়ূর আর কুণ্ডল–এ সকল দেখিয়া রাম চিনিতে পারিলেন। তখন তাঁহার দুঃখ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সুগ্রীব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল, 'বন্ধু, দুঃখ করিও না। আমরা নিশ্চয় সীতাকে আনিয়া দিব।' এইরূপে দুই বন্ধুতে দুজনার দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তারপর সুগ্রীব আর বালীর ঝগড়ার কথা উঠিল। একটা অসুর ছিল, তাহার নাম মায়াবী। সে দুন্দুভি নামক দানবের বড় ছেলে। একবার বালীর সঙ্গে মায়াবীর যুদ্ধ হয়। তখন বালীর তাড়া খাইয়া সে একটা প্রকাণ্ড গর্তের ভিতরে গিয়া ঢোকে। বালীও সুগ্রীবকে সেই গর্তের মুখে রাখিয়া সেই অসুরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভিতরে ঢুকিল।

সুগ্রীব এক বৎসর সেই গর্তের মুখের কাছে বসিয়া রহিল, কিন্তু বালী ফিরিল না। শেষে গর্তের ভিতর হইতে গরম রক্ত বাহির হইতে লাগিল, অসুরদিগের ভয়ানক গর্জন শোনা গেল। তাহাতে সুগ্রীব মনে করিল, বুঝি বালী মারা গিয়াছে। তখন সে অসুরের ভয়ে গর্তের মুখে এক প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিল। সেখানকার লোকেরা বালী মরিয়াছে জানিয়া সুগ্রীবকে রাজা করিল।

ইহার পর বালী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুগ্রীব রাজা হইয়াছে। তখন সে বলিল, 'আমি সুগ্রীবকে গর্তের মুখে রাখিয়া অসুর মারিতে গিয়াছিলাম। ইহার

মধ্যে হতভাগা আমার রাজ্য লইবার ফন্দি করিয়া আমাকে পাথর চাপা দিয়া আসিয়াছে!' এই বলিয়া সে সুগ্রীবকে অনেক কষ্ট দিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহার কোন কথাই শুনিল না।

তাহার পর হইতে সুগ্রীব বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আসিয়া বাস করিতেছে। মতঙ্গ মুনির শাপে বালী ঋষ্যমূক পর্বতে আসিতে পারে না। কাজেই সেখানে থাকিলে সুগ্রীবের ভয় অনেকটা কম থাকে।

রাম বালীকে মারিবেন শুনিয়া সুগ্রীব খুব সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু এ কাজ তিনি করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাহার মনে সন্দেহ ছিল। বালী যেমন তেমন বীর ছিল না।

দুন্দুভি নামে মহিষের চেহারাওয়ালা একটা অসুর ছিল। সে এমন প্রকাণ্ড ছিল, আর তাহার গায়ে এতই জোর ছিল যে, কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস পাইত না। দুন্দুভি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। সমুদ্র হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আমি পারিব না,, হিমালয়ের কাছে যাও!' হিমালয়ের কাছে গেলে হিমালয় বলিল, 'আমি কি যুদ্ধ জানি? আমি অমনি হার মানিতেছি।' তখন দুন্দুভি বলিল, 'তবে আমি কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব শীঘ্র বল, নহিলে তোমাকে গুঁতাইয়া গুঁড়া করিব।' হিমালয় বলিল, কিষ্কিন্ধ্যায় বানরের রাজা বালী থাকেন। তাঁহার কাছে যাও; তিনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পরিবেন।'

দুন্দুভি তখনই কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া বালীর দরজার সম্মুখে ভয়ানক গর্জন করিতে লাগিল। গর্জন শুনিয়া বালী সেখানে আসিলে দুন্দুভি বলিল, 'তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব।' তখন বালী দুই হাতে তাহার দুইটা শিং ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর তাহার লেজ ধরিয়া তাহাকে মাটিতে খালি আছাড়ের পর আছাড়-ঠিক যেমন করিয়া ধোপা কাপড় কাচে। এইরূপে সেটা মরিয়া গেলে পর সেই লেজ ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে একেবারে চার ক্রোশ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সেই সময় দুন্দুভির রক্ত মতঙ্গ মুনির আশ্রমে গিয়া পড়ে। তাহাতে সেই মুনি বালীকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, সে সেখানে গেলেই মাথা ফাটিয়া মরিবে। মাথা ফাটিবার ভয়ে বালী আর সেখানে আসে না। দুন্দুভির হাড়গুলি তখনও ঋষ্যমূক পর্বতে পড়িয়া ছিল। সুগ্রীব রামকে তাহা দেখাইল। বালীর গায়ে কি যেমন তেমন জোর ছিল! সাতটা বড় বড় শালগাছ একসঙ্গে ধরিয়া বালী তাহাতে এমনি নাড়া দিতে পারিত যে, সেই নাড়াতেই তাহাদের সমস্ত পাতা ঝরিয়া পড়িত।

কাজেই বালীকে সুগ্রীব এত ভয় করিত। আর সেই জন্যই রাম তাহাকে মারিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল। তাহার ভয় দেখিয়া লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, কী করিলে তোমার বিশ্বাস হইবে যে দাদা বালীকে মারিতে পারিবেন?' সুগ্রীব বলিল, 'ঐ যে সাতটা তালগাছ দেখিতেছ, বালী তাহার এক একটাকে একেবারে এপিঠ ওপিঠ করিয়া ফুঁড়িয়া ফেলিতে পারে। রাম যদি ঐ দুন্দুভির হাড় দুইশত ধনু দূরে ফেলিতে পারেন, আর বাণ মারিয়া একটা তালগাছ ফুটা করিতে পারেন, তবে বুঝিব তিনি বালীকে মারিতে পারিবেন।'

এই কথা শুনিয়া রাম হাসিতে হাসিতে পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া দুন্দুভির সেই পাহাড়ের মত হাড়গুলিকে ঠেলিয়া দিলেন, আর সেগুলি একেবারে চল্লিশ ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতেও সুগ্রীবের সন্দেহ গেল না। সে বলিল, 'এখন কিনা হাড়গুলি শুকাইয়া হাল্কা হইয়া গিয়াছে, এখন তো এত দূরে ফেলিতে পারিবেই। বালী আস্ত মহিষটাকে ফেলিয়াছিলেন, সেটা তখন মাংস আর চর্বিতে ইহার চেয়ে কত ভারী ছিল! আচ্ছা, একটা তালগাছ ফুটা কর দেখি!'

তাহা শুনিয়া রাম একটা বাণ মারিলেন। সে বাণ একেবারে সেই সাতটা তালগাছকে ফুঁড়িয়া পাহাড়টাকে সুদ্ধ ফুঁড়িয়া পাতালে ঢুকিয়া গেল। পাতালে গিয়াও কিন্তু সে থামিল না, থামিল আসিয়া রামের তূণে। তখন সুগ্রীব তাড়াতাড়ি রামের পায়ের ধূলা লইতে পারিলে বাঁচে। সে বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া রামের এক বাণ খাইলে বালী নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।

তবে আর কিসের ভয়! এখন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া বালীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতে পারিলেই কাজ হইবে। সুতরাং সকলে মিলিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিল।

সেখানে আসিয়া সুগ্রীব কোমরে কাপড় জড়াইয়া, আকাশ ফাটাইয়া চিৎকার করিতে লাগিল, 'কোথায় গেলে দাদা? আইস দেখি, একবার যুদ্ধ করি!' তাহা শুনিয়া রাগে বালীর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। আর কি সে বসিয়া থাকিতে পারে! তখনই দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত। তখন দুজনে কী ভয়ানক যুদ্ধ হইল, তাহা কী বলিব! কিল আর চড়ের চোটে দুজনের মুখ দিয়াই রক্ত উঠিতে লাগিল।

এদিকে রাম বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছেন। বালী আর সুগ্রীব দেখিতে একই রকম। তিনি মনে করিয়োছিলেন যে, যুদ্ধের সময় বালীকে বাণ মারিবেন। কিন্তু এখন কোন্‌টা যে বালী, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেছেন না। বাণ মারিলে তাহাতে বালী না মরিয়া যদি সুগ্রীব মরিয়া যায়, তবে তো সর্বনাশ।

কাজেই তখন আর বাণ মারা হইল না। সে যাত্রা সুগ্রীবকে কেবল অনেকগুলি কিল চড় খাইয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঋষ্যমূক পর্বতে পলাইয়া আসিতে হইল। সেখানে আসিয়া সে রামকে বলিল, 'বন্ধু, এই বুঝি তোমার কাজ! তোমার কথায় আমি বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া এতগুলি মার খাইলাম, আর তুমি চুপ করিয়া তামাশা দেখিলে!'

তখন রাম তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, 'বন্ধু, রাগ করিও না। আমি যে কেন বাণ মারি নাই, তাহা শোন। তুমি আর বালী দেখিতে ঠিক একই রকম। কাজেই তোমাদের কোন্‌টি কে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বালীকে মারিতে গিয়া যদি তোমাকে মারিয়া ফেলিতাম, তাহা হইলে লোকে আমাকে কী বলিত? তুমি আবার যুদ্ধ করিতে যাও, আর এমন একটা কোন চিহ্ন লইয়া যাও, যাহাতে আমি তোমাকে চিনিতে পারি। তাহা হইলে দেখিবে, এক বাণেই আমি বালীকে মারিয়া ফেলিব।'

এই কথা বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ, তুমি ফুল শুদ্ধ ঐ নাগপুষ্পী লতাটি আনিয়া, সুগ্রীবের গলায় বাঁধিয়া দাও।' লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন।

এবারে সুগ্রীবের মনে খুবই সাহস। সুতরাং সে আগের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া চ্যাঁচাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বালীও বাহির হইয়া আসিতে আর বিলম্ব করিল না। রাগ দু জনেরই সমান। দুজনেই বলে, 'ঘুষি মারিয়া তোর মাথা গুড়া করিয়া দিব! আর যুদ্ধও যেমন তেমন হইল না! কিল, চড়, লাথি, গুঁতা, আঁচড়, কামড়, কোনটারই ত্রুটি নাই। তারপর আবার গাছ পাথর লইয়াও যুদ্ধ হইল। কিন্তু বালীর গায় জোর বেশি থাকাতে, শেষে সুগ্রীব কাবু হইয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় রামের বাণ ভয়ানক শব্দে বালীর বুকে আসিয়া বিঁধিল। বাণের ঘায় বালীকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ তাহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তখন বালী রামকে অনেক গালি দিল।

রাম বলিলেন, 'তুমি দুষ্ট লোক, তোমাকে মারাতে আমার কোন অন্যায় হয় নাই। আমার বন্ধু নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তোমাকে মারিব, কাজেই তোমাকে মারিয়াছি।

বালীকে মারিয়া বন্ধুর উপকার করিয়াছেন, কাজেই ইহাতে রামের মনে কষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু শেষে যখন বালীর স্ত্রী তারা আর তাহার পুত্র অঙ্গদ সেখানে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন সুগ্রীবও চক্ষের জল রাখিতে পারিল

না। মরিবার সময় বালীর ভাল বুদ্ধি হইয়াছিল। তখন সে সুগ্রীবকে ডাকিয়া বলিল, 'ভাই, বুদ্ধির দোষে অন্যায় করিয়াছি, ক্ষমা কর। আমার অঙ্গদকে তোমার নিকট রাখিয়া গেলাম। তাহাকে তুমি তোমার পুত্রের মত দেখিও। এই বলিয়া সে নিজের গলার সোনার হার সুগ্রীবের গলায় পরাইয়া দিল। সেই সোনার হার বালীকে ইন্দ্র দিয়াছিলেন। তাহার গুণ অতি আশ্চর্য।

বালীর মৃত্যুর পর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজা আর অঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। তারপর সীতাকে খুঁজিবার আয়োজন হইতে লাগিল। সুগ্রীব হনুমানকে ডাকিয়া বলিল, 'হনুমান, শীঘ্র বানরদিগকে সংবাদ দাও। যে সকল বানর খুব শীঘ্র চলিতে পারে, তাহারা দশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সকল বানরকে ডাকিয়া উপস্থিত করুক। মহেন্দ্র পর্বতে, হিমালয়ে, বিন্ধ্যাচলে, কৈলাসে আর মন্দার পর্বতে যে সকল বানর আছে; সমুদ্রের পারে উদয় পর্বতে আর অস্ত পর্বতে, অঞ্জন পর্বতে আর পদ্মাচলে কালো কালো হাতির মতন যে সকল বানর আছে; আর মহারুণ পর্বতে যে সকল ভয়ঙ্কর বানর আছে, আমাদের দূতেরা তাহাদের সকলকেই এখানে ডাকিয়া আনুক।'

তখনই চারিদকে দূতসকল ছুটিয়া চলিল, আর দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর সকল বানর আসিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইতে লাগিল।

অঞ্জন পর্বত হইতে আসিল তিন কোটি বানর; কৈলাস হইতে আসিল এক হাজার কোটি; অস্তাচল হইতে দশ কোটি; হিমালয়ের বানর ফল খায়, কিন্তু সিংহের মত জোরালো সেই বানর এক হাজার খর্ব, গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিন্ধ্য পর্বতের কালো বানর এক হাজার কোটি আসিল; ক্ষীরোদ সমুদ্রের পারে যে সকল বানর নারিকেল খাইয়া থাকে, তাহারাও আসিল।

পৃথিবীর বানর আর আসিতে কেহ বাকি নাই। তাহা ছাড়া কিষ্কিন্ধ্যায় কত কোটি বানর আছে, তাহার হিসাব কে করিবে? বানরের পায়ের ধূলায় আকাশ অন্ধকার, সূর্য দেখা যায় না। কিষ্কিন্ধ্যাতে আর স্থান নাই। কত বানর আসিয়াছে, আর কত আসিতেছে। তাহাদের কেহ লাফায়, কেহ গর্জন করে, কেহ কেহ কুস্তি আরম্ভ করিয়াছে।

তারপর সুগ্রীব সীতাকে খুঁজিবার জন্য চারিদকে লোক পাঠাইল। পূর্বে, দক্ষিণে পশ্চিমে, উত্তরে কোনখানেই লোক পাঠাইতে বাকি রহিল না। সুগ্রীব তাহাদিগকে বলিল, এক মাসের মধ্যে তোমাদের ফিরিয়া আসা চাই; না আসিলে প্রাণদণ্ড হইবে।'

এই সকল বানরের মধ্যে হনুমানও ছিল। সুগ্রীব তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'হনুমান, তুমি জলে, শূন্যে স্বর্গে সকল স্থানেই যাইতে পার, আর সকল স্থানে খবরই জান। তোমার মতন বীর কে আছে? যাহাতে খুব ভাল করিয়া সীতার খোঁজ হয়, তুমি সেইরূপ করিবে।' হনুমানকে দেখিয়া রামও বুঝিয়াছিলেন যে, সে নিশ্চয়ই সীতার সংবাদ আনিতে পারিবে। তাই তিনি তাহার হাতে তাঁহার নিজের নাম লেখা একটি আংটি দিয়ে বলিলেন, এই আংটি দেখিলেই সীতা তোমাকে আমার লোক বলিয়া জানিতে পারিবেন।' হনুমান জোড় হাতে আংটিটি লইয়া রামকে প্রণাম করিল।

তারপর বানরেরা সীতার খোঁজ করিবার জন্য গর্জন করিতে করিতে চারিদিকে ছুটিয়া চলিল। তাহাদের কেহ বলে, 'আমি রাবণকে মারিয়া সীতাকে আনিব।' কেহ বলে, 'আরে না! তোমরা থাক, আমিই সব করিব।' কেহ বলে, 'আমি পাহাড় গুঁড়া করিব।' কেহ বলে, আমি এক যোজন লাফাইব।' কেহ বলে, 'আমি দশ যোজন লাফাইব।' কেহ বলে, 'আমি দশ হাজার যোজন লাফাইব।'

এইরূপ করিয়া বানরেরা সীতাকে খুঁজিতে বাহির হইল। ক্ষুধা হইলে তাহারা ফল খায়; রাত্রিতে গাছেই ঘুমায়। এক মাস পর্যন্ত এমনি করিয়া খুঁজিয়া, তাহারা পৃথিবীর কোন স্থান দেখিতে বাকি রাখিল না। কত দেশে, কত বনে, কত পাহাড়ে যে তাহারা গিয়াছিল, তাহার শেষ নাই।

সমুদ্রে যে সকল দ্বীপ আর পাহাড় আছে, সেখানে ভয়ঙ্কর কালো কালো জন্তু থাকে। তাহাদের কান পর্দার মত হইয়া ঠোঁট অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের একটা বৈ পা নাই, কিন্তু তবুও তাহারা বাতাসের মত ছোটে–সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

যেখানে পিঙ্গলবর্ণ কিরাতেরা থাকে–তাহারা কাঁচা মাছ খায়–সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

বাঘমুখো মানুষের দেশে, জব দ্বীপে, স্বর্ণ দ্বীপে, রৌপ্য দ্বীপে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

ভয়ঙ্কর ইক্ষু সমুদ্রের ধারে বিকটাকার রাক্ষসেরা থাকে, তাহারা জন্তুর ছায়া ধরিয়া টানিয়া টানিয়া তাহাকে খায়। সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তারপর লাল সমুদ্র। সেখানে রাক্ষসেরা পাহাড়ের চূড়া ধরিয়া বাদড়ের মত ঝুলিতে থাকে। সূর্যের তেজে তাহাদের মাথা গরম হইয়া গেলে

সমুদ্রের জলে পড়িয়া যায়। সেখান হইতে ঠাণ্ডা হইয়া আবার পাহাড়ে উঠিয়া ঝুলিতে থাকে। সেই লাল সমুদ্রে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

যেখানে সূর্য উদয় হয়, সেই সোনার পর্বতে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল। তাহার পরে কেবলই অন্ধকার; সেখানে কেহই যাইতে পারে না।

বৃষভ পর্বত দেখিতে ষাঁড়ের মতন, তাহাতে গন্ধবেরা থাকে। সেখানে নানারকম চন্দন গাছ আছে; কিন্তু তাহার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে বড়ই বিপদ হয়। সেখানেও তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

চন্দনগিরি নামক পর্বতে একরকম পক্ষী থাকে, তাহার নাম সিংহ পক্ষী। তাহারা হাতি আর তিমিমাছ ধরিয়া খায়। সেই পক্ষীর বাসায় তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

সুমেরু পর্বত পার হইলে অস্তাচল; সেখানে সূর্য অস্ত যান। ততদূর পর্যন্ত তাহারা সীতাকে খুঁজিতে গিয়াছিল। তাহার পর কেবল অন্দকার; সেখানে কেহই যাইতে পারে না।

উত্তরকুরু দেশের নদীতে সোনার পদ্ম ফোটে, আর তাহার তীরে মুক্তা ছড়ানো থাকে। সেই দেশে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তাহার পরে উত্তর সমুদ্র। তাহার মাঝখানে সোমগিরি নামক সোনার পর্বত আছে। সূর্য না উঠিলেও, সোমগিরির আলোকেই পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সোমগিরি বড় ভয়ানক পর্বত; সেখানে বানরেরা যাইতে পারে নাই।

এইরূপ করিয়া তাহারা সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না। এক মাস পরে আর সকলেই কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিল; কেবল হনুমান আর তাহার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা এখনও ফিরে নাই।

হনুমান, অঙ্গদ, তার, আর জাম্ববান অনেক বানর লইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল। তাহারা অনেক খুঁজিয়াও সীতাকে দেখিতে পাইল না। প্রথমে ভয়ানক একটা বনের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কাহিল। তারপর সেখান হইতে যে জায়গায় আসিল, তাহা আরও ভয়ঙ্কর। সে পাড়া দেশে গাছপালা নাই, জীবজন্তু জন্মাইতে পায় না, নদীসকল শুকাইয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পাইবার জো নাই। কবে কণ্ডু বলিয়া এক মুনি ছিলেন, এই হতভাগ্য দেশে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়। সেই পুত্রের শোকে কণ্ডু মুনি দেশটাকে শাপ দিয়া তাহার এই দশা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, সেখানেও তাহারা সীতার কোন সন্ধান পাইল না।

সেখান হইতে তাহারা আর একটা বনে গিয়া ঢুকিবামাত্রই একটা বিকটাকার অসুর তাহাদিগকে তাড়িয়া মারিতে আসিল। অঙ্গদ মনে করিল, বুঝি এটাই রাবণ। এইমনে করিয়া সে তাহাকে এমন এক চড় মারিল যে, সে চড় খাইয়া আর তাহার উঠিয়া যাইতে হইল না। এক চড়েই অসুরের বাছা মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিয়া অস্থির।

কিন্তু এত খুঁজিয়াও সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহাদের প্রাণ যায়, আর চলিবার শক্তি নাই। এমন সময়ে তাহারা একটা প্রকান্ড গর্তের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গর্তের নাম ঋক্ষ বিল। তাহার ভিতর হইতে হাঁস, সারস প্রকৃতি পক্ষী উড়িয়া বাহির হইতেছিল। সে সকল পক্ষীর শরীরে জল দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে, নিশ্চয়ই এই গর্তের ভিতরে জল আছে।

এই মনে করিয়া তাহারা সেই গর্তের ভিতর ঢুকিল। গর্তের মুখের কাছে খানিক দূর পর্যন্ত ভয়ানক অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারের পরেই একটি অতি সুন্দর এবং আশ্চর্য স্থান। সেখানকার সকলই সোনার। গাছপালাও সোনার, জলও মাছও সোনার, পদ্মফুলও সোনার। কেবল পদ্মের কাছে যে মৌমাছি উড়িতেছে, তাহা মানিকের।

সেই স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা একটি তপস্বিনী দেখিতে পাইল। তাঁহার শরীরে এত তেজ যে, দেখিলে মনে হয় যেন আগুন জ্বলিতেছে। তাহারা তপস্বিনীকে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে বলিল, 'মা, আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এখানে আসিয়াছি। এ আশ্চর্য দেশ কাহার, আর এ সকল জিনিস কী করিয়া সোনার হইল, তাহা জানিতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।'

তপস্বিনী বলিলেন, 'বাছা, এ স্থান ময় নামক দানবের তৈয়ারি। তোমরা এখানে কেন আসিয়াছ? ইহা যে অতি ভয়ঙ্কর স্থান!' এই বলিয়া তিনি নানারকম মিষ্ট ফল আর ঠান্ডা জল আনিয়া বানরদিগকে খাইতে দিলেন। বানরেরা তাহা খাইয়া তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

এদিকে আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত। সেই গর্তের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের এক মাস চলিয়া গেল, তবুও তাহারা বাহিরে আসিবার পথ পায় না। তাহা দেখিয়া সেই তপস্বিনী তাহাদিগকে বলিলেন, 'বাছাসকল, এ গর্তের ভিতর একবার আসিলে কেহই জীবন্ত বাহিরে যাইতে পারে না। যাহা হউক, তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা খানিক চোখ বুঝিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে বাহিরে

লইয়া যাইতেছি।' এই কথা শুনিয়া বানরেরা সেখানে চোখ বুঝিয়া রহিল, তারপর চাহিয়া দেখিল যে, তাহারা বাহিরে বিন্ধ্য পর্বতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিকটে সমুদ্র, তাহার গর্জন শোনা যাইতেছে।

গর্তের বাহিরে আসিয়া কিন্তু তাহাদের একটুও আনন্দ হইল না; বরং নানা চিন্তায় তাহাদের মন অস্থির হইয়া উঠিল। তাহাদের তখন বার বার এই কথা মনে হইতে লাগিল, এখন দেশে গিয়া কী বলিব? এক মাস তো চলিয়া গেল। কিন্তু হায়, সীতার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না! এখন কোন্ মুখে দেশে ফিরিব? সুগ্রীব আগেই বলিয়াছেন যে এক মাসের ভিতর না ফিরিলে তিনি মারিয়া ফেলিবেন। কাজেই আর কিসের ভরসায় বা দেশে ফিরিব? তাহার চেয়ে এইখানে না খাইয়া মরা অনেক ভাল।'

সুতরাং তাহারা স্থির করিল যে, তাহারা আর দেশে না গিয়া সেইখানেই না খাইয়া মারিবে। এইরূপে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহারা খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ মুখে সমুদ্রের ধারে বসিয়া রহিল। তখন তাহাদের কান্না ছাড়া আর কোন কাজ রহিল না। তাই তাহারা রামের কথা, সীতার কথা, জটায়ু পাখির কথা আর নিজেদের দুঃখের কথা বলিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল।

সেই বিন্ধ্য পর্বতের উপরে জটায়ুর দাদা সম্পাতি পাখি থাকিত। সে বানরদিগকে দেখিয়া বলিল, 'অনেক দিন পরে আমার জন্য এতগুলি খাবার জিনিস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমার বড়ই ভাগ্য! এই সকল বানরের এক একটা মরিবে আর আমি খাইব।

এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ হনুমানকে বলিল, 'ঐ দেখ যম নিজেই পাখি সাজিয়া আমাদিগকে লইতে আসিয়াছে। আমাদের প্রাণ গেল, তবুও রামের কাজ হইল না! জটায়ু যুদ্ধ করিয়া সীতার জন্য প্রাণ দিয়াছিল, জটায়ুই সুখী!'

জটায়ুর নাম শুনিয়া সম্পাতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'হায়! কে তোমরা আমার প্রাণের ভাই জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলিতেছ? জটায়ু কেমন করিয়া মরিল? আমার পাখা পুড়িয়া গিয়াছে, আমি উড়িতে পারি না। তোমরা আমাকে ধরিয়া নামাও।

সম্পাতির কথায় প্রথমে বানরদের বড় ভয় হইল, গাছে পাখিটাকে পাহাড় হইতে নামাইলে সে তাহাদিগকে ঠোকরাইয়া খাইতে আরম্ভ কে । কিন্তু শেষে তাহারা ভাবিল, 'আমরা যখন মরিতে বসিয়াছি, তখন ঐ পাখি। আমাদিগকে খাইলে আমরা যাহা চাই তাহাই তো হইবে, আর বেশি কী!' তখন অঙ্গদ

সম্পাতিকে পাহাড় হইতে নামাইয়া আনিল। তারপর নিজেদের পরিচয় দিয়া রামের বনবাসের কথা, সীতাকে লইয়া যাইবার কথা, জটায়ুর মৃত্যুর কথা, সুগ্রীবের আর রামের বন্ধুতার কথা, বালীর মৃত্যুর কথা, সীতাকে খুঁজিবার কথা, এক এক করিয়া সকলই তাহাকে বলিল।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া সম্পাতি বলিল, 'তোমরা যে জটায়ুর কথা বলিতেছ, সে আমার ভাই। তাহাকে যে মারিয়াছে, তাহার শাস্তি দিই এমন শক্তি আমার আর এখন নাই। ছেলেবেলায় আমরা দুই ভাই মিলিয়া ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় সূর্যের নিকট দিয়া আসিতে গিয়া তাহার তেজে জটায়যু অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহাকে ঢাকিতে গিয়া আমিও পাখা পুড়িয়া এখানে পড়িলাম। সেই অবধি আমি এখানে পড়িয়া আছি, জটায়ুর কী হইয়াছে আমি জানি না।'

ইহা শুনিয়া অঙ্গদ বলিল, 'রাবণ কোথায় থাকে তুমি জান কি?' সম্পাতি বলিল, 'একদিন রাবণকে আমি একটি মেয়েকে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। সেই মেয়েটি 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া কাঁদিতেছিলেন। বোধহয় তিনিই সীতা। সামনের এই সমুদ্র একশত যোজন চওড়া। তারপর লঙ্কাদ্বীপ, সেই লঙ্কায় রাবণের বাড়ি। তোমরা এই সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাও। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, তোমরা সেখান হইতে ভালো ভালোয় ফিরিয়া আসিতে পারিবে। রাবণ সীতাকে লইয়া যাইবার সময় আমার পুত্র সুপার্শ্ব তাহার পথ আটকাইয়াছিল, কিন্তু রাবণ মিনতি করাতে ছাড়িয়া দিল। আমার পাখা নাই, আমি আর কী করিতে পারি? আমি কেবল মুখের কথা বলিয়াই রামের উপকার করিব। তোমরা আর বিলম্ব করিও না। যাহা করিলে রামের কাজ হইতে পারে তাহা কর।'

এই কথা বলিয়া সম্পাতি আবার বলিল, 'সীতাকে যে রাবণ লইয়া যাইবে, এ কথা নিশাকর নামে এক মুনি আমাকে অনেকদিন আগেই বলিয়াছিলেন। আট হাজার বৎসর আগে এখানে নিশাকর মুনির আশ্রম ছিল। ছেলেবেলায় আমি আর জটায়ু তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম। তিনি আমাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমার যখন পাখা পুড়িয়া গেল, তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি দুঃখ করিও না; তোমার আবার পাখা হইবে। তুমি এখান হইতে কোথাও যাইও না। আমি তপস্যা করিয়া জানিয়াছি যে, রাজা দশরথের পুত্র রামের স্ত্রী সীতাকে রাবণ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। সেই সীতাকে খুঁজিবার জন্য রামের দূতেরা এখানে আসিলে, তুমি তাহাদিগকে

তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিও। তাহা হইলেই তোমার আবার পাখা হইবে।' সেই অবধি আমি তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া এইখানে বসিয়া আছি। আমার অনেক দুঃখ, কিন্তু রামের এই কাজটি করিবার জন্য আমি সকল দুঃখ ভুলিয়া আছি। সুপার্শ্ব সীতার সাহায্য করে নাই বলিয়া আমি তাহাকে বকিয়াছিলাম।'

কী আশ্চর্য! এই কথা বলিতে বলিতে সম্পাতির সুন্দর লাল রঙের পাখা হইল। তখন সে বানরদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ দেখ! মুনির বলে আমার আবার পাখা হইয়াছে, আর গায়ে যেন সেই আমার প্রথম বয়সের মতন জোর বোধ হইতেছে! তোমরা চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই সীতার সন্ধান পাইবে।' এই বলিয়া সম্পাতি আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া বানরদিগের মনে যে আনন্দ ও আশা হইল, তাহা আর কী বলিব! তখন তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সীতার খবর পাওয়া যাইব।

কিন্তু কি করিয়া সীতার খবর পাওয়া যাইবে? একশত যোজন সমুদ্র ডিঙাইতে পারিলে তবে তো লঙ্কা! আর সেই লঙ্কায় গেলে তবে তো সীতার সন্ধান হয়! বানরেরা সমুদ্রের ধারে আসিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। এত বড় সমুদ্র পার হইয়া সীতার সংবাদ আনা বড়ই কঠিন দেখা যাইতেছে। এ কাজ কে করিবে?

তখন অঙ্গদ বলিল, 'তোমরা তো সকলেই খুব বীর। বল দেখি ভাই, কে কত দূর লাফাইতে পার?'

অঙ্গদের কথা শুনিয়া তারা বলিল, 'আমি দশ যোজন লাফাইতে পারি।' গবাক্ষ বলিল, আমি কুড়ি যোজন পারি।' শরভ বলিল, 'আমি ত্রিশ যোজন পারি।' ঋষভ বলিল, 'আমি চল্লিশ যোজন পারি।' গন্ধমাদন বলিল, 'আমি পঞ্চাশ যোজন পারি।' মৈন্দ বলিল, 'আমি ষাট যোজন পারি।' দ্বিবিদ বলিল, 'সত্তর যোজন পারি।' সুষেণ বলিল, 'আশি যোজন পারি।' জাম্ববান বলিল, 'নব্বই যোজন পারি।' সকলের কথা শুনিয়া অঙ্গদ বলিল, 'আমি একশত যোজন সমুদ্র ডিঙাইতে পারি। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে।'

তখন জাম্ববান বলিল, 'রাজপুত্র, তুমি ইচ্ছা করিলে এক হাজার যোজন পার হইতে পার, কিন্তু তাহা করিতে যাইবে কেন? তুমি হুকুম দিবে, আমরা কাজ করিব। যে এ কাজের যোগ্য লোক, আমি তাহাকে ঠিক করিয়া দিতেছি।'

এই বলিয়া সে হনুমানকে বলিল, 'বাপু হনুমান, তুমি যে এত বড় বীর হইয়া এমন চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া আছ, তাহার কারণ কী? তুমি তো যেমন তেমন লোক নহ।' বাস্তবিকই হনুমান যেমন-তেমন লোক ছিল না। যখন হনুমানের জন্ম হয়, তখন সূর্য উঠিতেছিল। লাল সূর্য দেখিয়া সে মনে করিল, বুঝি তাহা কোনরূপ ফল। তাই সে লাফাইয়া তাহা ধরিতে গেল। সূর্যের তেজে তাহার কিছুই হয় নই, কিন্তু ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। বজ্র খাইয়াও সে মরিল না, কেবল পর্বতের উপরে পড়িয়া তাহার বাঁ পাশের হনু অর্থাৎ দাড়ি ভাংঙিয়া গেল। সেইজন্য তাহার নাম হইল হনুমান।

হনুমান পবন দেবতার পুত্র। ইন্দ্র হনুমানকে বজ্র মারাতে পবন রাগ করিয়া সমস্ত বাতাস বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে সংসারে লোক নিঃশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তখন দেবতারা দেখিলেন, বড় বিপদ! কাজেই তাঁহারা পবনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হনুমানকে বর দিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, 'কোনও অস্ত্রে হনুমানের মৃত্যু হইবে না।'

বড় হইয়া হনুমান অসাধারণ বীর হইয়াছে। সে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারে, কিছুতেই তাহাকে আটকায় না। সেই হনুমানকে ডাকিয়া একন জাম্ববান বলিল, 'বাছা, তুমি এ কাজটি করিলে আমাদের প্রাণ বাঁচে।'

তখন হনুমান বলিল, 'ঐ যে মহেন্দ্র পর্বত দেখা যাইতেছে, উহা খুব উঁচু আর মজবুত। ঐ স্থান হইতে লাফাইবার সুবিধা হইবে।' এই কথা বলিয়া সে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র পর্বত দেখিতে খুব সুন্দর, আর বড়ও কম নহে। তাহাতে বড় বড় বন আছে, ঝর-ঝর শব্দে কত ঝরনা বহিতেছে, পাখিরা গাছে বসিয়া মনের সুখে গান গাহিতেছে। আর বাঘ, সিংহ, হাতি প্রভৃতি জানোয়ারেরা দলের দলে বনের ভিতর চরিয়া বেড়াইতেছে। হনুমানের সঙ্গে সঙ্গে বানরের দল পর্বতে উঠিয়া ইহাদের সুখ ভাঙ্গিয়া দিল। তখন তাহারা কে কোথায় পলাইবে, তাহা ভাবিয়াই ব্যস্ত। পাখিরা উড়িতে লাগিল, সাপগুলি গর্তে ভিতর গিয়া লুকাইল, অনেকে পর্বত ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরকাণ্ড

মহেন্দ্র পর্বতে উঠিয়া হনুমান একটি ছোঠ মাঠের উপর দাঁড়াইল। তারপর জোড়হাতে দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া সে লাফ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে সময়ে তাহার শরীর এত বড় হইয়াছিল যে, তাহার ভার মহেন্দ্র পর্বতের সহ্য হইল না। সেই পর্বতের ভিতর হইতে তখন এমনি করিয়া জল বাহির হইয়াছিল যে, ভিজা গামছাকে নিংড়াইলে তাহার চেয়ে বেশি করিয়া জল বাহির হয় না। সেখানকার জীবজন্তুরা মনে করিল, বুঝি পৃথিবীর শেষ উপস্থিত। মুনিরা পর্বত ছাড়িয়া দূরে গিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

তারপর হনুমান দুই হাতে মাটিতে ভর দিয়া, লেজ মোটা করিয়া, শরীর কোঁচকাইয়া, পা গুটাইয়া এমনই ভয়ানক লাফ দিল যে, তাহার কশা মনে করিলেও যার পর নাই ছুটিয়া চলিল। সমুদ্রের জল গিয়া আকাশে উঠিল। তখন হনুমানকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন একটা পর্বত আকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিতেছে! সেজন্য দেবতারা তাহার কতই প্রশংসা করিলেন।

এদিকে সমুদ্র মৈনাক পর্বতকে ডাকিয়া বলিল, 'মৈনাক, তুমি শীঘ্র জলের বিতর হইতে মাথা জাগাইয়া দাও। হনুমানের বোধহয় পরিশ্রম হইয়াছে। সে তোমার চূড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবে।' মৈনাক পর্বত সমুদ্রের জলের নীচে থাকে। সমুদ্রের কথায় সে তখনই জল হইতে উঠিয়া হনুমানের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হনুমানের বিশ্রামের কিছুমাত্র দরকার নাই, তাহার উপরে আবার তাহার বড় তাড়াতাড়ি। কাজেই সে মৈনাককে বুকের ধাক্কায় সরাইয়া দিল।

তখন মৈনাক বলল, 'হনুমান, তুমি একটু আমার চূড়ায় দাঁড়াইয়া বিশ্রাম কর। আমার চূড়ায় মিষ্ট ফল আছে, তুমি তাহা আহার কর। সত্য যুগে যখন সকল পর্বতেরই পাখা ছিল, তখন তাহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া বেড়াইত; আর তাহাদের চাপে অনেক জীবজন্তু মারা যাইত। এইজন্য ইন্দ্র বজ্র দিয়া সকল পর্বতের পাখা কাটিয়া দেন। কিন্তু তোমার পিতা পবনদেব দয়া করিয়া আমাকে সমুদ্রের জলে উড়াইয়া ফেলাতে, ইন্দ্র আমার পাখা কাটিতে পারেন নাই। হনুমান, তোমার পিতা আমার এই উপকার করিয়াছিলেন। তুমি কি আমার চূড়ায় একটু বিশ্রাম করিয়া আমাকে সুখী করিবে না?'

হনুমান বলিল, 'মৈনাক, তোমার কথা শুনিয়াই আমার মনে যার পর নাই সুখ হইয়াছে। কিন্তু ভাই, আমি ব্যস্ত আছি, এখন বসিতে পারিব না। আমাকে মাপ কর।'

এই বলিয়া মৈনাককে ছুঁইয়া হনুমান আবার ছুটিয়া চলিল।

দেবতারা দেখিলেন যে, হনুমান বড়ই ভয়ানক কাজ করিতে চলিয়াছে। এ কাজ সে করিয়া আসিতে পারিবে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহাদের বড়ই ইচ্ছা হইল। তাই তাঁহারা নাগদিগের মাতা সুরসাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সুরসা ঠাকরুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটিবার হনুর পথটা আগলাইয়া দাঁড়ান তো! দেখি সে কেমন বীর!'

দেবতাদের কথায় সুরসা ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর বেশে হাঁ করিয়া হনুমানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হনুমান তাহা দেখিয়া নিজের শরীরটাকে দশ যোজন বড় করিয়া ফেলিল। সে মনে করিয়াছিল যে, এত বড় হইলে আর রাক্ষসী তাহাকে গিলিতে পারিবে না। কিন্তু রাক্ষসী তখনই তাহার দশ যোজনের জায়গায় বিশ যোজন হাঁ করিয়া বসিল।

কী বিপদ! হনুমান যতই বড় হয়, রাক্ষসী অমনি তাহার চেয়েও বড় হাঁ করে! দশ যোজন, বিশ যোজন, ত্রিশ যোজন, চল্লিশ যোজন, পঞ্চাশ যোজন, ষাট যোজন, আশি যোজন–হনুমান যতই বড় হইতেছে, রাক্ষসী তাহার চেয়েও বড় হাঁ করিতেছে! হনুমান যখন নব্বুই যোজন হইল, রাক্ষসীর হ্যাঁ তখন একশত যোজনআজেই শেষে হনুমান মনে করিল, 'আর বড় হইয়া কী হইবে? অন্য উপায় দেখা যাউক।

তখন সে হঠাৎ বুড়া আঙুলটির মতন ছোট হইয়া রাক্ষসীর পেটের ভিতর ঢুকিয়া, আবার তখনই বাহির হইয়া আসিল। হনুমান খুবই তাড়াতাড়ি ছোট

হইল, রাক্ষসীর মস্ত হাঁ-টাকে গুটাইয়া লইতে বোধহয় তাহার চেয়ে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। কাজেই হনুমানকে গিলা আর তাহার হয় নাই। তারপর হয়ত আবার বুড়া আঙুলের মতন ছোট হনুমানটি কোন্ খান দিয়া ফসকিয়া গিয়াছে, রাক্ষসী তাহা টের পায় নাই। যেমন করিয়াই হউক, নাগের মা ঠাকরুনকে হনুমান বড়ই ফাঁকিটা দিয়াছিল।

সুরসাকে ফাঁকি দিয়া বেশি দূর যাইতে না যাইতেই হনুমান আর একটা রাক্ষসীর হাতে পড়িল। এটার নাম সিংহিকা। হনুমান শূন্যে ছুটিয়া ছলিয়াছে, ইহার মধ্যে সিংহিকা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার ছায়া ধরিয়া বসিল। হনুমান হঠাৎ দেখিল যে, সে আর চলিতে পারিতেছে না, আর সমুদ্রের ভিতর হইতে একটা ভয়ানক রাক্ষসীও উঠিয়া আসিতেছে। সে জানিত যে, একরকম ভয়ঙ্কর রাক্ষস আছে, তাহারা জন্তুর ছায়া ধরিয়া তাহাকে আটকাইয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং সে বুঝিতে পারিল যে, এটা সেইরকম রাক্ষসী।

তখন হনুমান তাহার শরীর বড় করিতে লাগিল। রাক্ষসীও অমনি ঘোরতর গর্জনের সহিত একেবারে আকাশ পাতাল জোড়া ভয়ঙ্কর এক হাঁ করিয়া হনুকে গিলে আর কি! তাহা দেখিয়া হনুমান খুব ছোট হইয়া রাক্ষসীর পেটের ভিতর ঢুকিল। সুতরাং রাক্ষসী যে হনুকে খাইতে চাহিয়াছিল, সে কাজ তাহার হইয়াছিল বলিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয়, হজমটা তেমন ভাল করিয়া হয় নাই। কারণ, হনু তাহার পেটের ভিতর গিয়াই তাহার নাড়ি ভুঁড়ি সব ছিঁড়িয়া প্রাণ বাহির করিয়া দিল। কাজেই হনুকে হজম করিবার অবসর আর বেচারির রহিল না।

এতক্ষণে হনুমান লঙ্কার খুব কাছে আসিয়াছে। দূর হইতে সমুদ্রের তীরে সুন্দর গাছপালা দেখা যায়। তখন হনুমান ভাবিল, 'এই প্রকান্ড শরীর লইয়া লঙ্কায় গেলে রাক্ষসেরা কি মনে করিবে?' সুতরাং নামিবার পূর্বে সে তাহার শরীরটাকে খুব ছোট করিয়া লইল।

সমুদ্র পার হইয়া হনুমান যেখানে নামিল, সেটা পর্বত। এই পর্বতের নাম লম্ব পর্বত, ইহাকে ত্রিকূট পর্বতও বলে। এখান হইতে লঙ্কাপুরী বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে বিশ্বকর্মা লঙ্কা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। উহা স্বর্গের মত সুন্দর, আবার তেমনি মজবুত। লম্ব পর্বতের উপরেই শহর, তাহার চারিদিকে সোনার দেওয়াল। বড় বড় সিংহ দরজা আছে, তাহাও সোনার। শহরের চারিধারে রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিতেছে।

দূর হইতে কিছুকাল লঙ্কার শোভা দেখিয়া তারপর হনুমান ধীরে ধীরে তাহার উত্তর দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও বেলা ছিল বলিয়া পুরীর ভিতর ঢুকিল না। এত আলোর মধ্যে লঙ্কায় ঢুকিতে গেলে রাক্ষসেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার কাজই মাটি করিয়া দিবে। তাই বাকি বেলাটুকু সে চুপি চুপি বাহিরেই কাটাইল। তারপর যখন নগরে ঢুকিতে গেল, তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। তখন যে সে শহরে ঢুকিল, তাহাও একটি বিড়ালছানার মত ছোট হইয়া।

লঙ্কার বাড়ি ঘর যেমন বড় বড়, তেমনি সুন্দর। দরজা জানালা সোনার, রোয়াক পান্নার, সিঁড়িগুলি মানিকের। হনুমান এ সকলের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে, এমন সময় একটা বিকট রাক্ষসী কোথা হইতে আসিয়া তাহার পথ আটকাইয়া বলিল, 'কে রে তুই বানর? এখানে কি করিতে আসিয়াছিস? সত্য বল্, নহিলে তোকে মারিয়া ফেলিব!'

হুনমান বলিল, 'বলিতেছি। আগে বল তুমি কে, আর কেনই বা এত রাগ করিতেছ।' রাক্ষসী বলিল, 'আমি এই স্থানের দেবতা, আমারই নাম লঙ্কা। এ স্থানের লোকেরা আমারই পূজা করে, আমি এখানে পাহারা দিই। আজ আমার হাতে তোর মরণ দেখিতেছি!'

হনুমান তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিল, 'এই সুন্দর নগরটি একবার দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে!'

রাক্ষসী কহিল, 'আমাকে হারাইতে না পারিলে তুই নগর দেখিতে পাইবি না।'

হনুমান আবার মিনতি করিয়া বলিল, 'ঠাকরুণ, আমি দেখিয়াই চলিয়া যাইব!'

এ কথায় রাক্ষসী রাগিয়া হনুমানকে এক চড় মারিল। কাজেই তখন হনুমানেরও রাগ হইবে না কেন? তবে রাক্ষসী স্ত্রীলোক বলিয়া, তাহাকে বেশি মারিল, তাহাতেই বেচারী মাটিতে পড়িয়া মুখ সিটকাইয়া একেবারে অজ্ঞান! জ্ঞান হইলে সে বলিল, 'রক্ষা কর বাবা, আর না! ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন আমি বানরের কাছে হারিব, তখন রাক্ষসদের বড় বিপদ হইবে। এখন সে বিপদের সময় উপস্থিত দেখিতেছি। রাক্ষসদিগের আর রক্ষা নাই! এখন তুমি পুরীর ভিতর গিয়া যাহা ইচ্ছা কর।'

তখন হনুমান প্রাচীর ডিঙাইয়া লঙ্কার ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে ঘরে ঘরে তিল তিল করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও সীতার দেখা পাইল না।

সে সকল ঘরের কোথাও লোকজন গোলমাল করিতেছে, কোথাও পড়াশুনার শব্দ হইতেছে, কোথাও গুপ্তচরেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বসিয়া আছে। কোথাও সকলে মিলিয়া আমোদ করিতেছে। তাহাদের বাজনার শব্দ এমনি মিষ্ট যে, তাহাতে আপনা হইতে ঘুম আসিতে চায়। হনুমান এই রূপ কত স্থান দেখিল, কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইল না।

এক জায়গায় রাবণের পুষ্পক রথ রহিয়াছে। বিশ্বকর্মা তাহা ব্রহ্মার জন্য মণি-মুক্তা দিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বর্ষা সেই রথ কুবেরকে দেন। কুবেরের নিকট হইতে রাবণ তাহা কাড়িয়া আনে। হনুমান সেই রথের উপর উঠিয়া দেখিল।

রাবণের বাড়িতে সকলে খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়াছে। সেখানে কত আশ্চর্য জিনিসই হনুমানের চোখে পড়িল! সোনার জানালা, মানিকের সিঁড়ি, হাতির দাঁতের মূর্তি, স্ফটিকের থাম সকলই আশ্চর্য! ইহার মধ্যে আবার সকলের চেয়ে আশ্চর্য রাবণের শুইবার স্থানটি। স্ফটিকের বেদী, তাহার উপরে নীলকান্ত মণির খাট, তাহাতে সোনালী কাজ করা হাতির দাঁতের খুঁটি। কলের পুতুলসকল পাখা হাতে লইয়া সেই খাটে বাতাস করিতেছে।

রানী মন্দোদরীকে দেখিয়া একবার হনুমান মনে করিল, 'এই বুঝি সীতা।' কিন্তু আবার ভাবিল, 'সীতা এমন সুখে ঘুমাইতেছেন, তাহা কখনই হইতে পারে না। ইনি নিশ্চয়ই অন্য কেহ হইবেন।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে রাবণের খাবার ঘরে গেল। কত জন খাইতে খাইতে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সোনার থালা ঘটিতে, মণির কাজ করা স্ফটিকের বাটিতে কতরকম খাবার জিনিস রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাংসের ব্যঞ্জনই বা কতরকমের হরিণের মাংস, শুয়োরের মাংস, কিছুরই অভাব নাই। তাহা ছাড়া মাছ তো আছেই। হনুমান সকলই দেখিল।

সেখানে অনেক মেয়ে রহিয়াছেন। কেহ দেবতার কন্যা, কেহ নাগের কন্যা। দেখিতে সকলেই সুন্দর। আবার বিকট চেহারা এবং ভয়ঙ্কর দাঁতওয়ালা রাক্ষসের মেয়েও অনেক আছে। কিন্তু সীতা কোথাও নাই।

হনুমান অনেক করিয়া খুঁজিল। ঘরের পর বাগান, বাগানের পর ঘর, কিছুই সে বাকি রাখিল না। কিন্তু দেখিল, সীতা কোথাও নাই। তখন মনের দুঃখে সে বলিল, 'হায় হায়! এত করিয়াও সীতাকে দেখিতে পাইলাম না! হয়ত রাবণ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, না হয় তিনি নিজেই মরিয়া গিয়াছেন। আমার এত

পরিশ্রম সকলই বৃথা হইল। এখন আমি কোন্ মুখে ফিরিয়া যাইব? তাহার চেয়ে আমার মরিয়া যাওয়া ভাল!' তারপর আবার সে মনে করিল না, মরিব কেন? এখনও ত সকল স্থান দেখা হয় নাই। আরো ভাল করিয়া খুঁজি।'

এই বলিয়া সে আবার প্রাণপণে খুঁজিতে খুঁজিতে একটি অশোক বন দেখিতে পাইল সেই বনে যাইবামাত্র তাহার মনে হইল, 'এইখানে বোধহয় সীতাকে দেখিতে পাইব; হয়ত এইদিক দিয়া তিনি আসিবেন।' এই মনে করিয়া সে একটি শিংশপা অর্থাৎ শিশু গাছের পাতার আড়ালে লুকাইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল।

এমন সময় একটি মেয়ে সেইদিক দিয়া আসিলেন। না খাইয়া তাঁহার শরীর ভয়ানক রোগা আর ময়লা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি দেখিতে আশ্চর্যরূপ সুন্দর। রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে আর তিনি ক্রমাগত নিঃশ্বাস আর চোখের জল ফেলিয়া, কেবল যেন কাহার কথা ভাবিতেছেন। চুল বাঁধেন নাই, একখানি মাত্র হলদে রঙের ময়লা কাপড় পরিয়া আছেন। হনুমান তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে ইনিই সীতা। কারণ, তাহারা ঋষ্যমূক পর্বতে থাকিয়া যে মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়াছিল, ইনি তাঁহারই মতন দেখিতে।

ততক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন আর সীতার সহিত কথা বলিবার সুবিধা হইল না। তাই হনুমান আবার রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে সীতা বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। ভয়ঙ্কর রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের কোনটা লম্বা, কোনটা কুঁজো, কোনটা কানা; কোনটার কান হাতির কানের মত চ্যাটালো; কাহারও কান আবার ঘোড়ার কানের মত সুচালো। কোনটার গলা হাড়গিলার গলার মতন লম্বা। কোনটার গায় এত লোম যে দেখিলে মনে হয় যেন কম্বল পরিয়াছে। কোনটার মুখ শুয়োরের মুখের মতন, কোনটার মুখ বাঘের মুখের মতন, কোনটার মুখ শেয়ালের মুখের মতন। কোনটার হাতির পায়ের মতন পা। এক একটার আবার হাতির শুঁড়ের মতন শুঁড়ও আছে। কোনটার জিহ্বা লক লক করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।

চারিধারে এই সকল রাক্ষসি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের মাঝখানে সীতা সেই শিংশপা গাছের তলায় বসিয়া কেবলই কাঁদিতেছেন।

তারপর যখন অনেক রাত্রি হইল, তখন রাবণ সেখানে আসিল। সে আসিয়া সীতাকে খুশি করিবার জন্য কতই মিষ্ট কথা কহিল, আবার কত লোভও

দেখাইল। কিন্তু সীতা তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি তাহাকে বলিলেন, 'ওরে দুষ্ট, পাপ করাই বুঝি তোমার কাজ? তুমি যেমন লোক, রাম লক্ষ্মণ আসিয়া তোমাকে তেমনি সাজা দিবেন! যদি তুমি ভাল চাহ, এখনই আমাকে ফিরাইয়া দিয়া রামকে সন্তুষ্ট কর; নতুবা তোমার আর রক্ষা নাই। তুমি তো মরিবেই, তোমার লঙ্কায় আর একটি লোকও বাঁচিয়া থাকিবে না।'

এই কথায় রাবণ ভয়ানক রাগিয়া বলিল, 'আমি আর দুই মাস দেখিব। তাহার পর যদি তুমি আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা না বল, তবে তোমাকে কাটিয়া রাঁধিয়া খাইব!' সীতা বলিলেন, 'আমার এমন ক্ষমতা আছে যে আমি তোমাকে এখনই ভস্ম করিতে পারি। কেবল রাম আমাকে অনুমতি দেন নাই বলিয়া চুপ করিয়া আছি। তুমি কুবেরের ভাই, আর নিজে এমন বীর। তুমি কেন রামকে ফাঁকি দিয়া আমাকে লইয়া আসিলে?'

রাবণ দেখিল যে, সীতা কিছুতেই তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইতেছেন না। তখন সে রাক্ষসীদিগকে আরো বেশি করিয়া সীতাকে বুঝাইতে বলিয়া চলিয়া গেল।

রাবণ গেলে পরে রাক্ষসীরা আসিয়া সীতাকে বকিতে লাগিল। একজন বলিল, তোমার মতন এত বোকা ত দেখি নাই। এমন রাজা রাবণ, তাহাকে তুমি ভালবাসিতে চাহ না। আর একজন বলে, 'আমার কথা শোন, তোমার জেদ ছাড়িয়া দাও। তাহা হইলে তুমি সকলের রানী হইবে।' বিকটা বলিল, 'তুই অভাগী রাবণকে কেন ভালবাসিবি না?' দুর্মুখী বলিল, আমার কথা শোন, তোমার জেদ ছাড়িয়া দাও। তাহা হইলে তুমি সকলের রানী হইবে।' বিকটা বলিল, 'তুই অভাবগী রাবণকে কেন ভালবাসিবি না?' দুর্মুখী বলিল, 'আমাদের কথা রাখ্, নহিলে তোকে মারিয়া ফেলিব!'

কিন্তু সীতা ইহাদের কোন কথাতেই কান দিলেন না। তাহা দেখিয়া রাক্ষসীরা নিজ নিজ ঠোঁট চাটিতে চাটিতে কুড়াল লইয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। নিম্নোদরী বলিল, 'তোকে খাইব!' চন্দ্রোদরী বলিল, 'এটাকে মারিয়া ইহার যকৃত, প্লীহা ও বুক সব চিবাইয়া খাইব!

এইরূপ করিয়া রাক্ষসীরা সীতাকে মারিয়া খাইবার পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সীতা বলিলেন, 'তোমরা আমাকে মারিয়া খাইয়া ফেল। আমার বাঁচিয়া কি কাজ?' রাক্ষসীরা বলিল, 'আর দুই মাস থাক্, তারপর তোর মাংস ছিঁড়িয়া খাইব।'

এমন সময়ে ত্রিজটা নামে এক বুড়ী রাক্ষসী সেখানে আসিয়া বলিল, 'তোমরা সীতাকে কষ্ট দিও না। আজ আমি বড় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। বোধহয় রাবণ মরিয়া যাইবে আর লঙ্কাও ছারখার হইবে। তোমরা সীতাকে বকিয়াছ, এখন ইঁহার পাঁয়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহ। তাহা হইলে হয়ত তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।'

সীতা বলিলেন, 'ত্রিজটা, তোমার কথা সত্য হইলে আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিব।' এই কথা বলিয়া তিনি আবার কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর সেই শিংশপা গাছের নিকটে আসিয়া, এক হাতে গাছের ডাল ধরিয়া আর এক হাতে মাথার বেণী লইয়া বলিলেন, 'এই বেণী গলায় বাঁধিয়া মরিব।'

হনুমান শিংশপা গাছে বসিয়া সবই দেখিয়াছে, আর মনে মনে ভাবিতেছে, কি করিয়া সীতাকে একটু শান্ত করিবে। চারিদিকে রাক্ষসীর দল, সীতার কাছে গেলে তাহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। কিন্তু যদি শীঘ্র তাঁহার সহিত কথা বলা না হয়, তবে হয়ত তিনি তাহার পূর্বেই মরিয়া যাইবেন! আবার, কথা কহিতে গেলে, যদি রাবণ মনে করিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠেন, তবে সকল দিকই মাটি হয়। কাজেই এমন করিয়া কথা কহিতে হইবে, যাহাতে তিনি ভয় না পান।

এই ভাবিয়া সে সীতার আর একটু কাছে আসিয়া, আস্তে আস্তে মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিল, 'মহারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র বনে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মণ ঠাকুর আর মা সীতা। দুষ্ট রাবণ রামকে ফাঁকি দিয়া সীতাকে লইয়া আসিল। রাম তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতা করিলেন। তারপর সন্ধান করিবার জন্য সুগ্রীব আমাদিগকে পাঠাইলেন। কত দেশে, কত বনে আমরা সীতা মাকে খুঁজিয়াছি। শেষে সম্পাতি পাখির কথায় সাগর পার হইয়া, এখানে আসিয়া বুঝি মায়ের দেখা পাইলাম!' এই বলিয়া হনুমান চুপ করিল।

হনুমানের কথায় সীতা আশ্চর্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটি নিতান্ত ছোট বানর গাছের ডালে বসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে। তাহার গায়ের রঙ অশোক ফুলের মত লাল, চোখ সোনালী, পরনে সাদা কাপড়। ইহা দেখিয়া প্রথমে সীতার বড় ভয় হইল। কিন্তু শেষে অনেক ভাবিয়া তিনি বলিলেন, 'হে দেবতা বৃহস্পতি, হে ব্রহ্মা, হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, দোহাই আপনাদের! এই বানর যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য হউক!'

তখন হনুমান গাছ হইতে নামিয়া সীতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আপনি কে মা? কেনই বা এই বনে থাকিয়া এত দুঃখ করিতেছেন? আপনি যদি রামের সীতা হন, তবে আমার কথার উত্তর দিন।' এই কথা শুনিয়া সীতা বলিলেন, 'আমি রাজা দশরথের পুত্রবধু। আমার পিতার নাম জনক, স্বামী রামচন্দ্র। বিমাতার কথায় রাম বনে আসিয়াছিলেন। আমি আর লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। সেখান হইতে দুষ্ট রাবণ আমাকে ধরিয়া লঙ্কায় আনিয়াছে। দুই মাস পরে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।'

হনুমান সীতার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবার জন্য একটু একটু করিয়া কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে আবার সীতা ভয় পাইয়া বলিলেন, 'হায়! ইহার সহিত কেন কথা কহিলাম? এ হয়ত সেই দুষ্ট রাবণই বানর সাজিয়া আসিয়াছে!'

তাহা শুনিয়া হনুমান জোড়হাতে তাঁহাকে অনেক বুঝাইল। রামের সহিত কেমন করিয়া তাহার পরিচয় হইয়াছে, রাবণ সীতাকে লইয়া আসিবার পর রাম কি করিয়া দিন কাটাইতেছেন, তাহারাই বা কেমন করিয়া সীতাকে খুঁজিয়াছে, এ সকল কথার কিছুই সে তাঁহাকে বলিতে বাকি রাখিল না। সকলের শেষে, রামের সেই আংটিটি তাঁহার হাতে দিল।

আংটি দেখিয়া সীতার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন আনন্দে তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারপর তিনি মন খুলিয়া হনুমানকে রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ কেমন আছেন? তাঁহারা কেন আসিয়া রাবণকে মারিয়া ফেরিতেছেন না? সীতাকে না দেখিয়া রামের শরীর বেশি রোগা হইয়া যায় নাই ত? এইরূপ কত প্রশ্নই তিনি করিলেন। রামের কথা যত জিজ্ঞাসা করেন, ততই তাঁহার আরো জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে।

হনুমান যার পর নাই মিষ্ট কথায় তাঁহার কথার উত্তর দিয়া তারপর বলিল, 'মা, আসুন, আপনাকে পিঠে করিয়া রামের কাছে লইয়া যাই।'

তাহা শুনিয়া সীতা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতটুকু বানরটি হইয়া তুমি কি করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে?' হনুমান বলিল, ইচ্ছা করিলেই, মা, আমি ঢের বড় হইতে পারি।'

এই বলিয়া সে দেখিতে দেখিতে পর্বতের মত বড় হইয়া বলিল, 'মা, আপনার আশীর্বাদে রাবণ আর তাহার লোকজন ঘরবাড়ি-সুদ্ধ এই লঙ্কাটাকে

আমি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারি। আপনার কিছু ভয় নাই। আমার পিঠে উঠিয়া বসুন।'

সীতা বলিলেন, 'তুমি যে পারিবে তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়া যাইবার সময় আমি নিশ্চয়ই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব, কাজেই আমার যাওয়া ঠিক নহে। তুমি শীঘ্র তাঁহাদিগকে এখানে লইয়া আইস।'

হনুমান বলিল, 'মা, আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আচ্ছা, তবে আমাকে এমন একটা কিছু জিনিস দিন, যাহা দেখিয়া রামের বিশ্বাস হইবে যে আমি যথার্থই আপনাকে দেখিয়া গিয়াছি।' একথায় সীতা তাঁহার মাথার মণি খুলিয়া হনুমানের হাতে দিলেন। হনুমান সেই মণি লইয়া, সীতাকে প্রণাম করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইল। যাইবার সময় তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়া বলিল, 'মা আপনার কোন চিন্তা নাই। শীঘ্রই আপনার কষ্ট দূর হইবে।'

সীতার নিকট বিদায় লইয়া হনুমান ভাবিতে লাগিল, 'সীতার সন্ধান ত পাইয়াছি। এখন রাক্ষসেরা কেমন যুদ্ধ জানে, তাহার কিছু খবর লইয়া যাইতে পারিলে মন্দ হয় না। আমি যদি এই সুন্দর অশোক বনটিকে নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে। তখন আমিও তাহাদের বিদ্যা বুঝিতে পারিব।'

এই বলিয়া হনুমান বিষম হুপ-হাপ্, দুপ্-দাপ্, চড়-চড়্, মড়্-মড়্ শব্দে অশোক বন ভাঙিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সে সেই বনের এমন দুর্দশা করিল যে, আগুন দিয়া পোড়াইলেও তাহার চেয়ে বেশি হয় না। এইরূপে সমস্ত বাগানটিকে ছারখার করিয়া সে একটি সিংহ-দরজার উপরে বসিয়া দেখিতে লাগিল, রাক্ষসেরা এখন কি করে।

এদিকে রাক্ষসেরা বন ভাঙার শব্দে সেখানে আসিয়া দেখিল যে, হনুমান তাহার কাজ শেষ করিয়া সিংহ দরজায় চড়িয়া গর্জন করিতেছে। তখন তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, একটা ভয়ঙ্কর বানর আসিয়া অশোক বন লণ্ডভন্ড করিয়াছে! বোধহয় সে রামের লোক। সে সীতার সহিত কথা কহিয়াছে আর তিনি যেখানে আছেন, সে জায়গাটুকু ভাঙে নাই।'

একথা শুনিয়া রাবণ রাগে তাহার কুড়ি চোখ লাল আর কুড়ি পাটি দাঁত কড়্মড়্ করিয়া তখনই হুকুম দিল, 'শীঘ্র ওটাকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।' হুকুম পায়ামাত্রই বড় বড় রাক্ষসেরা মুষল, মুদগর হাতে মহা তেজের সহিত হনুমানকে বাঁধিয়া আনিতে চলিল। তাহাদিগকে দেখিয়া হনুমান সেই সিংহ দরজার বিশাল হুড়কাটা হাতে লইয়া বলিল, 'জয়, রামচন্দ্রের জয়!'

তারপর আর কয়েক মুহূর্তের বেশি বিলম্ব হইল না। ইহারই মধ্যে সে রাক্ষসগুলির মাথা গুঁড়া করিয়া, আবার সেই সিংহ-দরজায় উঠিয়া ভাল মানুষের মত বসিয়াছে-যেন সে কিছুই জানে না।

খানিক পরে তাহার মনে হইল যে, ঐ যে পাহাড়ের মতন বড় বাড়িটা দেখা যাইতেছে, সেটাকে ভাঙিতে পারিলে ত বেশ হয়! যেমন কথা তেমন কাজ। অমনি সেই বাড়িটাকে চুরমার করিয়া হনু আবার সিংহ দরজায় উঠিয়া বসিয়া আছে।

ততক্ষণে অসংখ্য পাহারাওয়ালা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হনুমানও আর কিছু না পাইয়া, সেই ভাঙা বাড়ির একটা সোনার থাম লইয়াই সে সকল পাহারাওয়ালাকে পিষিয়া দিল। এদিকে রাবণ জাম্বুমালীকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহার বুক পরিঘের ঘায় ভাঙিতে হনুমানের অধিক সময় লাগিল না। তারপর মন্ত্রীর ছেলেরা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। তাহাদিগকেও হনুমান কয়েকটি কিল চড়েই শেষ করিয়া আবার সেই সিংহ দরজায় উঠিয়া বসিয়া রহিল।

এইরূপে হনুমান লঙ্কায় সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধাইল, তাহা কি বলিব! বড় বড় বীরেরা যুদ্ধ করিতে আসে আর হনু তাহাদিগকে গুঁড়া করিয়া দেয়। ঘোড়া দিয়া ঘোড়া মারে, হাতি মারে, রাক্ষস দিয়া রাক্ষস মারে।

দুর্ধর, প্রঘস, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ আর যুপাক্ষ, ইহাদের এক একজন অসাধারণ যোদ্ধা। হনুমান দুর্ধরের রথের উপর খালি লাফাইয়া পড়িয়াই রথ আর ঘোড়া সুদ্ধ তাহাকে থেঁৎলা কলিয়া দিল। তারপর শালগাছ দিয়া বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষকে শেষ করা, পর্বতের চূড়া দিয়া প্রঘস ও ভাসকর্ণকে পেষা, আর এটাতে ওঠাতে ঠোকাঠুকি করিয়া সঙ্গের রাক্ষসগুলির মাথা ফাটান, এ সকল ত হনুর পক্ষে কেবল খেলা! সে কাজ সে চক্ষের পলকে সারিয়া আবার সেই সিংহ দরজায় উঠিয়া বসিল।

ইহার পর রাবণের পুত্র অক্ষ আট ঘোড়ার রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। সে খুবই যুদ্ধ করিতে পারিত আর প্রথমে অনেক বাণ মারিয়া হনুমানকে একটু ব্যস্ত করিয়াই তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহা অধিক সময়ের জন্য নহে। তাহার পরেই হনুমান এক চড়ে তাহার রথের আটটা ঘোড়াকে আর আট কিল মারিয়া রথখানিকে গুঁড়া করিয়া দিল। তখন অক্ষ রথ হইতে না নামিয়া আর যায় কোথায়? আর হনুও তখন তাহার পা ধরিয়া তাহাকে মাটির উপর এমনি এক আছাড় দিল যে, তাহাতেই বেচারা একেবারে চুরমার। তারপর হনুমান আবার সেই সিংহ দরজায় উঠিয়া বসিয়া রহিল।

অক্ষের মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাবণ তাহার বড় ছেলে ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন্‌ইন্দ্রিজিতের মত যোদ্ধা লঙ্কায় আর কেহ ছিল না। কিন্তু সে আসিয়াও প্রথমে হনুমানের কিছু করিতে পারে নাই। আর, কি করিয়াই বা পারিবে? বাণ আসিবার আগেই হনুমান সরিয়া বসিয়া থাকে, কাজেই তাহা আর তাহার গায়ে লাগিতে পারে না। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাগের ভরে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়া দিল। ব্রহ্মা তাহাকে সেই অস্ত্র দিয়াছিলেন। সে অস্ত্রকে কেহ আটকাইতে পারে না, কাজেই হনুমানও তাহা আটকাইতে পারিল না। আবার হনুমানকে ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন যে, কোন অস্ত্রেই তাহার মৃত্যু হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রও তাহাকে মারিতে না পারিয়া খালি বাঁধিয়া ফেলিল।

ব্রহ্মাস্ত্রে বাঁধা পড়িয়া হনুমান ভাবিল, 'বেশ হইয়াছে! এখন এরা আমাকে রাবণের কাছে লইয়া যাইবে আর আমিও তাহার সহিত দুটা কথাবার্তা কহিতে পারিব।'

হনুমান বাঁধা পড়িয়াছে দেখিয়া রাক্ষসেরা আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাহাদের উৎসাহ দেখে কে! তাহারা মোটা মোটা শনের দড়ি আনিয়া তাহাকে ত শক্ত করিয়া বাঁধিলই, তাহা ছাড়া তাহাদের যতদূর সাধ্য গালি দিতে আর ভ্যাঙচাইতেও ছাড়িল না। হনুমান কিছুই করে না, খালি চ্যাঁচাইতেছে।

এদিকে কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে। কারণ, সে বাঁধন এমনি রকমের যে তাহার উপর আবার দড়ি দিয়া বাঁধিতে গেলে, তাহা আপনি খুলিয়া যায়। যাহা হউক, বাঁধন যে খুলিয়া গিয়াছে, এ কথা হনুমান রাক্ষসদিগকে জানিতে দিল না। ইন্দ্রজিৎ টের পাইল বটে, কিন্তু অন্য রাক্ষসেরা তাহার কিছুই বুঝিল না। তাহারা মনে করিল, 'বাঃ, খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়াছি!' তারপর বিস্তর টানাটানি আর 'হেঁইয়ো!' হেইয়ো!' করিয়া তাহারা হনুমানকে মারিতে মারিতে রাবণের সভায় লইয়া চলিল।

সেখানে রাক্ষসেরা তাহাকে দেখিয়া কি আশ্চর্যই হইল! কেহ বলিল, 'আরে, এ বানর কে? এটা এখানে কি করিতে আসিল?' কেহ বলিল, 'এটাকে শীঘ্র মারিয়া ফেল! কেহ বলিল, 'পোড়াইয়া ফেল!' কেহ বলিল, 'খাইয়া ফেল!' এই বলিয়া তাহারা হনুমানকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

হনুমান কিছু বলে না। সে কেবল ক্রমাগত রাবণকে আর তাহার সভার ঘরখানি চাহিয়া দেখিতেছে। মণি মাণিক্যের কাজ করা স্ফটিকের সিংহাসনে রাবণ বসিয়া আছে। তাহার দশ মাথায় দশটি ঝকঝকে সোনার মুকুট।

শরীরটি কুচকুচে কালো, তাহাতে রক্তচন্দন মাখানো, তাহার উপর সোনার হার। এক একটা মুখ যেন এক একটা জালা! তাহাতে আবার দাঁতগুলি ধারালো, আর ঠোঁটগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হনুমান তাহাকে দেখিয়াই মনে মনে ভাবিল যে, এ ব্যক্তি যেমন তেমন বীর নহে!

এদিকে রাক্ষসেরা হনুমানকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে 'তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস?' এখানে আসিলি কি করিতে?' 'বন ভাঙিলি কেন?' কে তোকে পাঠাইয়াছে?' ঠিক করিয়া বল, তাহা হইলে এখনই তোকে ছাড়িয়া দিব, মিথ্যা কহিলে মারিয়া ফেলিব!'

তাহা শুনিয়া হনুমান রাবণকে বলিল, 'রাজা রাবণ, আমি বানর। তোমাকে দেখিতে লঙ্কায় আসিয়াছিলাম। সহজে তোমার দেখা না পাইয়া বন ভাঙিয়াছি! তাহাতে রাক্ষসেরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল, কাজেই আমিও তাহাদিগকে মারিয়াছি। আমি রামের দূত, পবনের পুত্র, আমার নাম হনুমান। তোমার ধনজন এত আছে, তোমার কি এমন অন্যায় কাজ করা উচিত? তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি, আমার কথা শোন, সীতাকে রাখিও না; তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবে। কি বলিব, রাম আমাকে অনুমতি দেন নাই, নহিলে আমি এখনই তোমার লঙ্কা গুঁড়া করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতাম।'

তখন রাবণ তাহার লাল লাল কুড়িটা চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'কোথারে জল্লাদসকল, কাট্ ত এটাকে!' কিন্তু বিভীষণ তাহাকে বারণ করিল।

বিভীষণ রাবণের ছোট ভাই, আর অতিশয় বুদ্ধিমান লোক। সে বলিল, 'মহারাজ, করেন কি? দূতকে কখনও মারিতে আছে? তাহাতে যে ভয়ানক পাপ! দূতকে চাবুক মারা যায়, তাহার মাথা মুড়াইয়া দেওয়া যায়, শরীরের কোন স্থান খোঁড়া করিয়াও দেওয়া যায়; কিন্তু তাহাকে মারা কখনই হইতে পারে না। আর, এটাকে মারিয়া ফেলিলে খবর লইয়া কে যাইবে? তাহা হইলে রাম লক্ষ্মণই বা কি করিয়া এখানে আসিবে, আর রাক্ষসেরাই বা কি করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া, নিজেদের বাহাদুরি দেখাইবে!'

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণ বলিল, 'বিভীষণ, ঠিক বলিয়াছ। ইহাকে মারিয়া কাজ নাই। এই দুষ্টের লেজ পোড়াইয়া দাও, তাহা হইলে দেশে গিয়া আর মুখ দেখাইতে পারিবে না!'

তখন রাক্ষসেরা বোঝা বোঝা নেকড়া আনিয়া হনুমানের লেজে জড়াইতে লাগিল। যত জড়ায়, হনুমানের লেজ ততই বড় হয়, আর বেশি নেকড়া

লাগে। লঙ্কার নেকড়া ফুরাইয়া যাইবার গতিক আর কি! নেকড়া জড়ান হইলে, তাহাতে তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

সেই লেজের আগুন দিয়া হনুমান যে কি কাণ্ড করিবে, তাহা আগে জানিলে কখনই তাহারা এমন করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইত না। হনুমান প্রথমেই ত সেই জ্বলন্ত লেজটি ঘুরাইয়া রাক্ষসদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল। যত মারে রাক্ষসেরাও ততই বেশি করিয়া তাহাকে বাঁধে, আর তাহাকে দেখিয়া ছেলে, বুড়ো, আর স্ত্রীলোকেরা হাততালি দিয়া হাসে। এইরূপ করিয়া রাক্ষসেরা লঙ্কার গলি গলি হনুমানকে লইয়া তামাশা দেখাইতে লাগিল। অবশ্য, এ খবর সীতার কাছে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তাহা শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিলেন, 'হে দেবতা অগ্নি, আমি যদি কোন পুন্য কাজ করিয়া থাকি, তবে তুমি হনুমানকে পোড়াইও না!'

এদিকে হনুমান ভাবিতেছে, 'কি আশ্চর্য! আমার লেজে এত আগুন, তবু তাহাতে জ্বালা নাই কেন? আগুন যেন আমার কাছে হিমের মতন লাগিতেছে! বুঝিয়াছি, আমার পিতা পবন, আর রাম, আর সীতা, ইহাদের দয়াতেই এইরূপ হইয়াছে।'

তখন সে মুহূর্তের মধ্যে তাহার শরীরটাকে খুব ছোট করিয়া ফেলিল। তাহাতে বাঁধনের দড়িগুলি আপনা হইতেই খুলিয়া পড়ায়, রাক্ষসেরা আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

তারপর একটা প্রকাণ্ড দরজার হুড়কা লইয়া রাক্ষসগুলির মাথা ভাঙিতে আর কতক্ষণ লাগে।

বাঁধন ঝাড়িয়া ফেলিয়া হনুমান ভাবিল, 'এখন কি করি? সমুদ্র ডিঙাইয়া, বন ভাঙিয়া, রাক্ষস অনেক মারিয়াছি। এখন এই লেজের আগুন দিয়া এই সকল ঘর দুয়ার পোড়াইতে পারিলেই কাজ শেষ হয়।

যেই এই কথা মনে করা; অমনি এক লাফে একেবারে ঘরের চালে গিয়া উঠা। তারপর ঘর হইতে ঘরে, সেখান হইতে বাগানে, বাগান হইতে আবার ঘরের ছাদে, এইরূপ করিয়া হনুমান লঙ্কায় আগুন লাগাইয়া ফিরিতে লাগিল। আগে প্রহস্তের বাড়ি, তারপর মহাপার্শ্বের বাড়ি, তারপর বজ্রদংষ্ট্র, ইন্দ্রজিৎ, জাম্বুমালী, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ এইরূপ করিয়া একেবারে রাজার বাড়ি পর্যন্ত কিছুই বাকি রহিল না। আগুন যতই জ্বলিয়া উঠিল, বাতাসও ততই ছুটিয়া চলিল, আর হনুমানও ততই মনের সুখে গর্জন করিতে লাগিল।

সেদিন লঙ্কায় কি সর্বনাশই উপস্থিত হইয়াছিল! যেদিকে চাহিয়া দেখা যায়, সেইদিকেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার, রাক্ষসেরা যে পথ দেখিয়া পলাইবে, তাহারও জো নাই। চারিদিকে কেবল বাতাসের শোঁ-শোঁ, পোড়া কাঠ ফাটার পট-পট, বাড়ি ঘর পড়ার মড়-মড়, আর রাক্ষসদিগের হায় হায়! বেচারারা পাগলের মতন ছুটাছুটি করিতেছে আর বলিতেছে, 'হায় হায়! সর্বনাশ হইল!'—'বাবা গো! এটা কি আসিল!' ছেলে বুড়া স্ত্রী পুরুষ কত রাক্ষস যে পড়িয়া মরিল, তাহার লেখাজোখা নাই!

হনুমান তাহার লেজের আগুন সমুদ্রের জল দিয়া সহজেই নিবাইয়াছিল। কিন্তু লঙ্কার সে সর্বনেশে আগুন কেহই নিবাইতে পারিল না। সেদিন আগুনের তামাশা দেখিয়া হনুমানের মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার আনন্দ অধিকক্ষণ রহিল না। এতক্ষণ সে লঙ্কা পোড়াইতে ব্যস্ত ছিল, তাই সীতার কথা তাহার মনে হয় নাই। তাঁহার কথা মনে হইবামাত্রই সে ভয়ে আর দুঃখে অস্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'হায় হায়! কি করিলাম? সীতাকে সুদ্ধ পোড়াইয়া মারিলাম। এখন আমি রামের কাছে গিয়া কি বলিব?' যাহা হউক, তখনই আবার তাহার এ কথাও মনে হইল যে, সীতা পুড়িয়া মরিবেন ইহা কি সম্ভব? যেন আকাশ হইতে কেহ বলিতেছে, 'কি আশ্চর্য! লঙ্কা পুড়িয়া চারখার হইল, কিন্তু সীতার কিছুই হয় নাই!'

এ কথা শুনিয়া হনুমানের যে কি আনন্দ হইল তাহা কি বলিব! সে অমনি দুই লাফে গিয়া সীতার নিকট উপস্থিত। তারপর তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়া আর তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া, সে সেখান হইতে বিদায় হইল।

লঙ্কার কাছেই অরিষ্ট পর্বত। হনুমান সীতার নিকট বিদায় লইয়া সেই পর্বতে গিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে, সেখান হইতে লাফ দিলে সমুদ্র পার হওয়ার সুবিধা হইবে।

এদিকে হনুমানের সঙ্গের বানরেরা সমুদ্রের ধারে অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা কেবল ভাবিতেছে, কখন হনুমান ফিরিয়া আসিবে। এমন সময় দূর হইতে তাহার গর্জন এবং শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিতে পাইল। তাহা শুনিয়া জাম্ববান বলিল, 'নিশ্চয় হনুমান সীতার সন্ধান পাইয়াছে, নহিলে এত চ্যাঁচাইবে কেন?

জাম্ববানের কথায় বানরেরা আনন্দে লাফালাফি করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ গাছে চড়ে, কেহ লেজ নাড়ে, কেহ কাপড় উড়ায়, আবার কেহ মাথা তুলিয়া খালি হনুমানের পথের দিকে চাহিয়া আছে। এমন সময় হনুমান ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিয়া টিপ্ করিয়া সেইখানে পড়িল।

তাহাকে দেখিয়া বানরেরা আর কি তাহাদের আনন্দ সামলাইয়া রাখিতে পারে! তাহারা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিল। কি করিয়া তাহাকে আদর আর সম্মান দেখাইবে, তাহাই যেন তাহারা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেহ তাহার বসিবার জন্য গাছের ডাল বিছাইয়া দেয়, কেহ ফল মূল আনিয়া দেয়, কেহ কেহ কিচিমিচি করে। অনেকে কেবল হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হনুমান আগে জাম্ববান অঙ্গদ প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিয়া, তারপর সীতার এবং লঙ্কার খবর সকলকে শুনাইল।

এতদিনে বানরদিগের মনে আবার সুখ আসিয়াছে। তাহাদের কাজ হইয়াছে, এখন সংবাদ লইয়া দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত। ফিরিবার পূর্বে একবার তাহারা মনে করিয়াছিল সীতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিল যে রামের অনুমতি ভিন্ন তাহা করা উচিত নহে। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া চলিল। তিন দিন আগে তাহাদের মনে যেমন ভয় আর দুঃখ ছিল, এখন তেমনি উৎসাহ আর আনন্দ।

তাহারা যখন কিষ্কিন্ধ্যার কাছে সুগ্রীবের মধুবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের উৎসাহ আর থামাইয়া রাখিতে পারিল না। অঙ্গদ বলিল, 'তোমরা পেট ভরিয়া মধু খাও।' তাহা শুনিয়া বানরেরাও আর তিলমাত্র বিলম্ব করিল না। পেট ভরিয়া মধু আর ফল ত তাহারা খাইলই, তাহার উপর আবার গাছপালা ভাঙিয়া বনের দুর্দশার একশেষ করিল। তাহাদের না আছে মৌমাছির ভয়, না আছে পাহারাওয়ালার চিন্তা।

সুগ্রীবের মামা দধিমুখ সেই বনের প্রহরী ছিল। সে তাহাদিগকে কত বারণ করি, কত ধমকাইল, দুই একজনকে মারিলও। কিন্তু বানরেরা কি তাহাতে থামে? বরং তাহারা উল্টিয়া দধিমুখেরই নানারকম দুর্দশা করিল। তাহাকে আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া, কিলাইয়া, লেজ ধরিয়া টানিয়া বেচারার আর কিছু রাখিল না।

তখন দধিমুখ আর তাহার লোকেরা বানরদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু যুদ্ধ করিয়া তাহারা পারিবে কেন? লাভের মধ্যে অঙ্গদের হাতে মার খাইয়া দধিমুখের হাড় ভাঙিবার গতিক হইল।

তখন বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে সুগ্রীবের নিকট গিয়া নালিশ করিল। সুগ্রীব তাহার কথা শুনিয়া বলিল, 'মামা, তোমার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। নিশ্চয় উহারা সীতার সন্ধান পাইয়াছে। তাহা না হইলে কি এমন

পাগলামি করিতে পারে? মামা, তুমি দুঃখ করিও না; শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে পাঠাইয়া দাও।'

দধিমুখও তাহা শুনিয়া ভাবিল, 'বা! তাই ত, উহারা নিশ্চয় সীতার খবর আনিয়াছে।' তখন কোথায় বা গেল তাহার বেদনা, কোথায় বা গেল তাহার কান্না। সে সকল দুঃখ ভুলিয়া অমনি হনুমান প্রভৃতিকে আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তাহারা আসিলে রাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব সকল কথাই শুনিতে পাইলেন। হনুমান রামকে সীতার সংবাদ বলিয়া সেই মণি তাঁহার হাতে দিল। রাম মণি হাতে লইয়া, বারবার তাহা দেখিতে লাগলেন। তারপর তাহা বুকে চাপিয়া ধরিলেন আর তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

লঙ্কাকাণ্ড

তারপর সকলে উৎসাহে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া লঙ্কায় চলিল। সকলের আগে চলিল নল। সে পথ পরীক্ষায় বড়ই পণ্ডিত। কোন্ পথ ভাল, কোথায় পরিষ্কার জল, কোথায় মিষ্ট ফল, নলের সব মুখস্থ্ আছে। নল যে পথে যাইতেছে, সেই পথ ধরিয়া অন্যেরা তাহার পিছু পিছু চলিয়াছে। হনুমান রামকে আর অঙ্গদ লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া লইয়াছে। অন্য বানরেরা গাছের ফল খাইয়া, ফুলের শোভা দেখিয়া, মনের সুখে দল বাঁধিয়া চলিয়াছে। এইরূপে তাহারা সেই মহেন্দ্র পর্বতের কাছে সমুদ্রের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে রাবণ রাক্ষসদের সহিত বসিয়া পরামর্শ করিতেছে। সে বলিল, 'বল দেখি এখন উপায় কি! বড়ই যে মুস্কিল দেখিতেছি! লঙ্কায় আসিয়া প্রবেশ করা ত যেমন তেমন সহজ কাজ নহে! সেই কাজ সামান্য একটা বানরে করিয়া দিয়া গেল, আমার ঘর বাড়ি ভাঙিল, এতগুলি রাক্ষসও মারিল! বল দেখি এখন কি করা যায়।' রাক্ষসেরা বলিল, 'সে কি মহারাজ! আমাদের এত সৈন্য, এত অস্ত্র আর আপনি এমন বীর! পৃথিবী, আকাশ, পাতাল সকলই আপনি জয় করিয়াছেন। বানর আর মানুষকে আপনার কিসের ভয়? আপনার নিজেরও যুদ্ধ করিতে হইবে না; একা ইন্দ্রজিৎই মানুষ আর বানর মারিয়া শেষ করিবেন।'

প্রহস্ত বলিল, 'আমি একটা বুদ্ধি করিয়াছি। জোয়ান জোয়ান রাক্ষসেরা ভরতের সৈন্য সাজিয়া উহাদের কাছে যাইবে। উহারা কিছুতে বুঝিতে পারিবে না। আর ইহার মধ্যে আমাদের লোকেরা এক সময় তাহাদিগকে বাগে পাইয়া মারিয়া শেষ করিবে।'

রাক্ষসেরা সকলেই এইরূপ বলিতেছে, তাহা দেখিয়া বিভীষণ বলিল, 'মহারাজ, যাহার জোর নাই; সে কি সাহস করিয়া লঙ্কায় যুদ্ধ করিতে আসে? রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দিন, নহিলে বড়ই বিপদ হইবে। আপনি রামের এত অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতেই ত রাম যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এ কাজ আপনার উচিত হয় নাই।'

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণ রাগের ভরে সভা হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন আবার মস্ত সভা। সেদিনও খোসামুদে রাক্ষসেরা বলিল, 'মহারাজ, কোন ভয় নাই, যুদ্ধ করুন।' আর কেবল বিভীষণ বলিল, 'শীঘ্র সীতাকে ফিরাইয়া দিন।' সেজন্য রাবণ রাগের ভরে তাহাকে যত ইচ্ছা গালি দিয়া শেষে বলিল, 'হতভাগা, আর কেহ যদি এই কথা বলিত, তাহা হইলে এখনই তাহাকে কাটিয়া ফেলিতাম!'

তখন বিভীষণ বলিল, 'মহারাজ, আপনি আমার গুরুজন। আপনাকে বুঝাইতে পারি, আমার এমন সাধ্য কি? আমার অন্যায় হইয়া থাকিলে ক্ষমা করিবেন। ভাল কথা বলিতে গেলাম, তাহাতে আপনার এত রাগ হইল। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, আমি চলিলাম।' এই বলিয়া বিভীষণ আর চারিজন রাক্ষস সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাবণের সভা ছাড়িয়া বিভীষণ আর সেই চারিজন রাক্ষস সমুদ্র পার হইয়া রামের নিকটে চলিয়া আসিল। সেখানে সুগ্রীব আর অন্যা অন্য বানরদিগকে দেখিয়া বিভীষণ বলিল, 'আমি রাবণের ভাই, আমার নাম বিভীষণ। আমি সীতাকে ফিরাইয়া দিবার কথা বলাতে , রাবণ আমাকে গালি দিয়াছেন। তাই আমি রামের কাছে থাকিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব তাড়াতাড়ি রামের কাছে গিয়া সংবাদ দিল। বিভীষণকে সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। হনুমান ছাড়া বানরদিগের অন্য কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে নাই। তাই তাহারা সকলে বিভীষণকে জায়গা দিতে রামকে বারবার নিষেধ করিল। খালি হনুমান বলিল, 'উহার মুখ দেখিয়া ত উহাকে দুষ্ট লোক বলিয়া আমার বোধ হয় না। ও যথার্থই আমাদের সহিত বন্ধুতা করিতে আসিয়াছে। উহাকে জায়গা দেওয়া উচিত।'

সকলের কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, 'যে আশ্রয় চায়, তাহাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত। সে যদি দুষ্টও হয়, তথাপি তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে আমার অনিষ্ট করে। তোমরা শীঘ্র তাহাকে ডাকিয়া আন।'

তখন বিভীষণ আসিয়া রামকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'রাবণ আমায় অপমান করিয়াছেন, তাই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। এখন আপনার ইচ্ছা হয় আমাকে রাখুন, না হয় মারিয়া ফেলুন।'

রাম মিষ্ট কথায় তাহার ভয় দূর করিয়া বলিলেন, 'বিভীষণ, আমি রাবণকে মারিয়া তোমাকে রাজা করিব।' বিভীষণও বলিল, 'আমি প্রাণ দিয়া আপনার সাহায্য করিব।'

তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'চল, আমরা এখানেই বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করি।' রাজা হইবার সময় স্নান করিতে হয়, সেই স্নানকে অভিষেক বলে। রামের কথায় লক্ষ্মণ তখনই সমুদ্রের জলে বিভীষণকে অভিষেক করিয়া তাহাকে লঙ্কার রাজা করিলেন।

তারপর সুগ্রীব আর হনুমান বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, সমুদ্র পার হইব কি করিয়া?' বিভীষণ বলিল, 'রাম যদি সমুদ্রের পূজা করেন, তবে অবশ্য সমুদ্র পার হওয়া যাইবে।

এ কথা শুনিয়া বানরেরা তখনই পূজার জোগাড় করিয়া, সমুদ্রের ধারে কুশাসন বিছাইয়া দিল। রাম তাহাতে শুইয়া রহিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন রাম সেইখানে পড়িয়া আছেন, তবুও সমুদ্র তাঁহার সংবাদ লয় না। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'এত করিয়া পূজা করিলাম, আর তুমি গ্রাহ্যই করিলে না! তোমার এতই অহঙ্কার! আচ্ছা দাঁড়াও তোমাকে শুষিয়া ফেলিতে কতক্ষণ লাগে!'

এই বলিয়া রাম ধনুক লইয়া তাহাতে ব্রহ্মাস্ত্র জুড়িলেন। সে অস্ত্রের তেজে চন্দ্র সূর্য অবধি কাঁপিতে লাগিল। আর সাগরও প্রাণের ভয়ে অমনি হাত জোড় করিয়া উপস্থিত হইল। তারপর সে রামের নিকট অনেক মিনতি করিয়া বলিল, 'এই নল বিশ্বকর্মার পুত্র। নল আমার উপর সেতু বাঁধিয়া দিলেই সকলে পার হইতে পারিবে। সেতু যাহাতে না ভাঙে, সেজন্য আমি এখন হইতে খুব স্থির হইয়া থাকিব।'

তখনই বানরেরা গাছ আর পাথর আনিয়া সমুদ্রের ধারে ফেরিতে লাগিল। নল কি আশ্চর্য কারিকর! সেই গাছ পাথর দিয়া একশত যোজন লম্বা সুন্দর সেতু প্রস্তুত করিতে ছয় দিনের বেশি লাগিল না। সেই সেতুর উপর দিয়া সকলে পার হইয়া লঙ্কায় আসিল।

রাম লঙ্কায় আসিয়াছেন শুনিয়া রাবণ শুক আর সারণ নামক তাহার দুইজন মন্ত্রীকে চুপি চুপি তাঁহার সৈন্য দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। শুক সারণ বানর সাজিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে ফাঁকিতে বিভীষণ ভুলিল না। সে তখনই তাহাদিগকে ধরিয়া রামের কাছে লইয়া গেল।

শুক সারণ ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে, এ যাত্রা আর তাহাদের রক্ষা নাই; কেন না, শত্রুর লোক ঐরূপ চুরি করিয়া খবর লইতে আসিলে তাহাকে মারিয়া ফেরাই দস্তুর। তাহারা রামের পায়ে পড়িয়া বলিল, আমরা রাবণের হুকুমে আপনার সৈন্য গণিতে আসিয়াছিলাম।

তাহা শুনিয়া রাম হাসিয়া বলিল, 'তোমাদের কিছু ভয় নাই। যদি সৈন্য দেখা হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাও। আর যদি দেখা না হইয়া থাকে, তবে ভাল করিয়া দেখিয়া যাও।

এ কথা শুনিয়া শুক সারণ রামকে কত আশীর্বাদ করিল! তারপর তাহারা গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই। ইহারা বড় ভয়ানক বীর! সীতাকে ফিরাইয়া দিন।'

রাবণ বলিল, 'তোমরা যে ভারি ভয় পাইয়াছ! বল দেখি, এই পৃথিবীতে এমন কে আছে যে আমাকে যুদ্ধ করিয়া হারাইতে পারে?' এই বলিয়া সে ছাদে উঠিয়া দেখিতে গেল, রামের সৈন্য কিরূপ।

সাদা সাদা মেঘ আসিয়া যেমন করিয়া আকাশ ঢাকে, তেমনি করিয়া বানরেতে লঙ্কার চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। এই সকল সৈন্য দেখিয়া সারণ রাবণকে কহিল, 'মহারাজ, ঐ দেখুন নীল বীর, দশ হাজার যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। ঐ দেখুন বালীর পুত্র অঙ্গ দ, উহার সঙ্গেঅনেক কোটি সৈন্য। ঐ নল, যে ঐ সেতু বাঁধিয়াছে। ঐ শ্বেত, ঐ কুমুদ, ঐ চণ্ড, ঐ সংরম্ভ, ঐ শরভ, ঐ বিনত, ঐ পনস, ঐ ক্রথন, ঐ গবয়, ঐ হয়। ঐ জাম্ববান, দেখুন তাহার সহিত কত ভাল্লুক আসিয়াছে, ঐ রম্ভ, ঐ সন্নাদন, ঐ প্রমাথী, ঐ গবাক্ষ, ঐ কেশরী, ঐ শতাবলী!'

'মহারাজ, ঐ যে শাল গাছের মতন বড় বড় বানর দাঁড়াইয়া আচে, উহারা সুগ্রীবের লোক। উহাদের বাড়ি কিষ্কিন্ধ্যায়; উহারা সকলেই বড় বড় বীর। উহাদের মধ্যে ঐ দুইজনার নাম মৈন্দ আর দ্বিবিদ। আর হনুমানকে বোধহয় চিনিতে পারিয়েছেন; ঐ যে বসিয়া আছে। হনুমানের কাছে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি রাম। তাঁহার কথা আর কি বলিব! যেমন দেখিতে সুন্দর,

তেমনি দয়ালু, তেমনি বিদ্বান, তেমনি ধার্মিক, আর তেমনি বীর। উহার পাশে ঐ লক্ষ্মণ বসিয়া–সোনার মত রঙ, কোঁকড়ান কালো চুল, চওড়া বুক। দেখিতে যেমন, গুণেও তেমনি। উহার মতন বীর কোথাও নাই। লক্ষ্মণের পাশে ঐ দেখুন বিভীষণ বসিয়া আছেন। শুনিয়াছি রাম নাকি তাঁহাকে লঙ্কার রাজা করিয়াছেন। ঐ সুগ্রীব, যাঁহার গলায় সোনার হার আর শরীর পাহাড়ের মতন বড়।'

'মহারাজ, এক শত লক্ষে এক কোটি লক্ষ কোটিতে এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কুতে এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কুতে এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দে এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দে এক পদ্ম, লক্ষ পদ্মে এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্মে এক খর্ব, লক্ষ খর্বে এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্রে এক মহৌঘ। রামের সঙ্গে এইরূপ হিসাবে একহাজার কোটি, একশত শঙ্কু, একহাজার মহাশঙ্কু, একশত বৃন্দ, একহাজার মহাবৃন্দ, একশত পদ্ম একহাজার মহাপদ্ম, একশত খর্ব, একশত সমুদ্র আর একহাজার মহৌঘ সৈন্য আসিয়াছে।'

এ-সকল দেখিয়া শুনিয়া রাবণের মনে খুবই ভয় হইল। কিন্তু সে তাহা শুক সারণকে জানিতে দিল না। বাহিরে সে যার পর নাই রাগ দেখাইয়া, শুক সারণকে বকিয়া সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল।

এরপর একদিন কি হইল শুন। লঙ্কায় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে একটা জাদুকর রাক্ষস ছিল। রাবণ তাহাকে দিয়া ঠিক রামের মাথার মতন একটা মাথা, আর তাঁহার ধনুর্বানের মতন ধনুর্বাণ প্রস্তুত করাইল। তারপর অশোক বনে গিয়া সেই মাথা আর ধনুক সীতাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই দেখ, তোমার রামকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। রাত্রিতে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল, তখন আমার সৈন্যেরা গিয়া তাহার মাথা কাটিয়াছে, আর বিভীষণকে ধরিয়া আনিয়াছে। লক্ষ্মণ পলাইয়াছে, সুগ্রীবের ঘাড় ভাঙিয়াছে, হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি আর সকলে মরিয়া গিয়াছে।। এখন আর রামের কথা ভাবিয়া কি করিবে?'

রাবণের কথা শুনিয়া আর সেই মাথা দেখিয়া সীতা ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় একটা দারোয়ান আসিয়া রাবণকে ডাকিয়া লইয়া গেল। রাবণ যাইতে না যাইতেই সেই জাদুর তৈয়ারি মুণ্ড আর ধনুক কোথায় যে মিলাইল, কিছু বুঝা গেল না।

বিভীষণের স্ত্রী সরমাকে রাবণ সর্বদা সীতার কাছে থাকিতে বলিয়াছিল। সরমা সীতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, আর সর্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকিত।

রাবণ চলিয়া গেলে পরেও সীতা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন দেখিয়া সরমা বলিল, 'সীতা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? রাবণের কথা সকলই মিথ্যা। যুদ্ধও হয় নাই, রামেরও কিছু হয় নাই। আমি নিজে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। রাক্ষসেরা বড়ই ভয় পাইয়াছে। রাম নিশ্চয় তাহাদিগকে মারিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' সরমা আর সীতা এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময় বানরদিগের গর্জন শুনা যাইতে লাগিল। সেই গর্জন শুনিয়া রাক্ষসেরা মনে করিল, বুঝি সর্বনাশ উপস্থিত।

রামের সৈন্য যেখানে ছিল, তাহার কাছেই সুবেল পর্বত। সেই পর্বতের উপর উঠিয়া বানরেরা যুদ্ধের আগের রাত্রি কাটাইল। সুবেল পর্বতের উপর হইতে লঙ্কার সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই পরদিন সকালে উঠিয়া সকলে সেখান হইতে লঙ্কার শোভা দেখিতে লাগিল। সেই লঙ্কার উত্তর দরজার কাছে রাবণ নিজে দাঁড়াইয়া। তাঁহার দুই পাশে চামর দুলিতেছে, মাথার উপরে সাদা ছাতা, গলায় গজমতির মালা।

রাবণকে দেখিয়া সুগ্রীবের আর সহ্য হইল না। সে তখনই এক লাফে সেই পর্বতের উপর হইতে একেবারে লঙ্কার দরজার উপর গিয়া পড়িল। আর এক লাফে একেবারে রাবণের ঘাড়ে। ঘাড়ে পড়িয়াই হাসিতে হাসিতে তাহার মুকুটটি কাড়িয়া লইয়া মাটিতে এক আছাড়! তারপর মল্লযুদ্ধ। রাবণ সুগ্রীবকে ধরিয়া মাটিতে আছড়াইল, সুগ্রীবও রাবণকে আছড়াইল। কিল, চড়, লাথি দুইজনে দুইজনকে যে কত মারিল, তাহার লেখাজোখা নাই। এইরূপ রাবণকে অপমান আর নাকাল করিয়া, সুগ্রীব এক লাফে আবার সুবেল পর্বতে চলিয়া আসিল। লজ্জায় তখন রাবণের মুখে আর কথাটি নাই!

তারপর রামের সৈন্য পর্বত হইতে নামিয়া লঙ্কার দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। লঙ্কার কোন দরজা দিয়াই তাহারা রাক্ষসদিগের বাহির হইবার পথ রাখিল না। উত্তর দরজায় রাবণ ছিল, রাম লক্ষ্মণ নিজে গিয়া সেই দরজা আটকাইলেন। মৈন্দ, দ্বিবিদ আর নীল পূর্ব দরজা আটকাইল। ঋষভ, গবাক্ষ, গয় আর গবয়কে লইয়া দক্ষিণ দরজায় রহিল। পশ্চিম দরজায় গাছ পাথর লইয়া নিজে হনুমান। উত্তর দরজা আর পশ্চিম দরজার মাঝখানে সুগ্রীব। এই রূপে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এখন রাবণ বাহিরে আসিলেই হয়।

তখন রাম অঙ্গদকে রাবণের সভায় পাঠাইয়া দিলেন। রাবণ পাত্র মিত্র লইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় অঙ্গদ সেখানে গিয়া উপস্থিত। সেখানে গিয়া সে রাবণকে বলিল, 'আমি শ্রীরামের দূত, আমার নাম অঙ্গদ। আমা রপিতার নাম বালী। তাঁহার কথা বোধহয় তোমার এখনও মনে আছে। রাম বলিলেন তুমি শীঘ্র বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ কর। তিনি তোমাকে বধ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিবেন।'

এখানে একটা হাসির কথা বলি। অঙ্গদ যে রাবণকে তাহার পিতার নাম বলিয়া 'তাহার কথা বোধহয় তোমার এখনও মনে আছে' বলিল, তাহার কারণ কি জান? রাবণ একবার বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া বড়ই নাকাল হইয়াছিল। রাবণ সকলকে যুদ্ধে হারাইয়া ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইত, আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না। যুদ্ধ করিবার আর লোক না পাইয়া শেষে সে একদিন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। বালী তখন সমুদ্রের ধারে চোখ বুঝিয়া সন্ধ্যা করিতেছিল। রাবণ মনে করিল, 'এই বেলা উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জব্দ করি। চোখ বুঝিয়া আছে, দেখিতে পাইবে না।' এই বলিয়া ত সে পিছন দিক হইতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে নাড়িতে পারিল না। ততক্ষণে বালী সন্ধ্যা সারিয়া, রাবণ মহাশয়কে পাখিটির মত খপ্ করিয়া বগলে পুরিয়া বসিয়াছে। বালী পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারি সমুদ্রের ধারে বসিয়া চারিবার সন্ধ্যা করিত। সবে তখন তাহার এক বার সন্ধ্যা শেষ হইয়াছিল; সুতরাং সে রাবণকে বগলে করিয়াই আরও তিনবার সন্ধ্যা করিল। এদিকে সেই বগলের চাপে, গরমে, ঘামে আর গন্ধে বেচারা চ্যাপ্টা হইয়া, সিদ্ধ হইয়া, দম আটকাইয়া, পেট ঢাক হইয়া নাকালের একশেষ! মরে নাই কেবল ব্রহ্মার বলে। তাই অঙ্গদ এখন বলিল, 'বোধহয় মনে আছে।'

তাহা শুনিয়া রাবণ বলল, 'এই মুর্খকে এখনই টুকরা টুকরা করিয়া কাট্‌ত রে!' এই কথা বলিতে বলিতেই চারিটা রাক্ষস আসিয়া অঙ্গদকে ধরিয়া ফেলিল। অঙ্গদও সেই চারিটা রাক্ষসকে বগলে লইয়া এক লাফে একেবারে ছাদের উপরে। সেখান হইতে রাক্ষসগুলিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া আর চাদখানিকে গুঁড়া করিয়া, আর এক লাফে সে রামের কাছে আসিয়া হাজির।

ইহার পর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কত রাক্ষস আর কত বানর যে মরিতে লাগিল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। চারিদিকে মার মার, কাট

কাট কাট, দুপ দুপ, ঘড় ঘড়, ঝান ঝান, ঠক ঠক ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল, রাত্রিতেও তাহার শেষ নাই। যুদ্ধের স্থানে মরা রাক্ষস আর বানরের পাহাড় হইয়া গেল, রক্তের নদী বহিয়া চলিল, তবুও যুদ্ধের বিরা নাই।

এক স্থানে পাচটা সেনাপতি অসংখ্য রাক্ষস লইয়া বড়ই গর্জন করিতে করিতে রামের সহিত যুদ্ধ জুড়িয়াছিল। আবার দেখিতে দেখিতে রামের বাণ খাইয়া পাঁচজনেই পালাইবার পথ পাইতেছে না।

আর এক স্থানে অঙ্গদ আর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ। অঙ্গদ লাথি মারিয়া ইন্দ্রজিতের সারথি আর ঘোড়া চ্যাপ্টা করিয়া দিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ দেখিল, সামনে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে পারিয়া উঠা সম্ভব নহে। কাজেই তখন সে মেঘের আড়ালে লুকাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শিবের কাছ থেকে বর পাইয়া ইন্দ্রজিৎ এই অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল যে সে মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে। অন্যরা তাহাকে দেখিতে পাইতেছিল না কিন্তু সে সবাইকে দেখিতে পাইতেছিল এবং মেঘের আড়াল থেকে তীর ছুড়িয়া সবাকে মারিতে লাগিলেন।

মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষণ কে নাগপাশ নামক অস্ত্র ছুড়িয়া মারিল। সঙ্গে সঙ্গে রাম ও লক্ষণের সর্বাঙ্গ সাপ আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। যেহেতু ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে ছিল তাই কেউ কাকে কিছুই করিতে পারিল না।

ইন্দ্রজিৎ আরো বেশি বেশি তীর ছুড়িয়া রাম-লক্ষণ কে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলা অবশেষে মনে করিল রাম লক্ষণ বুঝি মরিয়াছে। তখন সে ফিরিয়া গিয়ে পিতা রাবণ কে বলিলেন, "বাবা, আজ রাম-লক্ষণ কে বধ করিয়া আসিয়াছি ।"

এদিকে রাম-লক্ষণ তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। সুষেণ ভাল ঔষধ তৈরি করিতে জানিত। সে সবাইকে বলিল ক্ষীরদ সাগরের ওপারে বিশাল্যরণী নামক সঞ্জীবনী ঔষধ আছে তাহা আনিতে পারিলেই শুধুমাত্র রাম-লক্ষণ কে বাঁচানো সম্ভব।

এমন সময় ভয়ানক ঝড় উঠিয়া গাছপালা ভাঙিতে লাগিল, সাপেরা তাড়াতাড়ি গর্তের ভিতরে লুকাতে চলিল, সমুদ্রের জন্তু আর আকাশের

পক্ষীসকল ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া সকলে চাহিয়া দেখিল, গরুড় আসিতেছে। তাহারই পাখার বাতাসে এরূপ কাণ্ড উপস্থিত। গরুড়কে দেখিয়াই ইন্দ্রজিতের সাপেরা ভাবিল, 'সর্বনাশ! আমাদের যম আসিয়াছে!' তখন তাহারা রাম লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। গরুড়কে সাপেরা বড়ই ভয় করে, কারণ সে সাপ দেখিলেই ধরিয়া খায়।

গরুড় রাম লক্ষ্মণের গায় হাত বুলাইয়া দিবামাত্রই, তাঁহাদের শরীরের সকল জ্বালা চলিয়া গেল, এমন কি, বাণের দাগ পর্যন্ত রহিল না। তখন দুই ভাই আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন্তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহাদের জোর আর সাহস দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

গরুড়কে দেখিয়া রাম বলিলেন, 'পাখি, তুমি কে? বড়ই ভয়ানক বিপদ হইতে তুমি আমাদিগকে বাঁচাইলে!' গরুড় বলিল, 'আমার নাম গরুড়, ইন্দ্রজিৎ তোমাদিগকে বাঁধিয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়াছি। তোমাদিগকে আমি বড়ই ভালবাসি। এখন যাই, এই যুদ্ধে তোমরা নিশ্চয় জিতিবে।' এই কথা বলিয়া গরুড় চলিয়া গেল। রাম লক্ষ্মণকে সুস্থ দেখিয়া, বানরদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে আনন্দে তাহারা কোলাহল করিয়া লঙ্কা কাঁপাইয়া তুলিল।

বানরের কোলাহল শুনিয়া রাবণ বলিল, 'রাম লক্ষ্মণ ত মরিয়া গিয়াছে, তবে আবার বানরদিগের কিসের কোলহল? দেখ ত বিষয়টা কি!' রাক্ষসেরা দেখিয়া আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, ইন্দ্রজিৎ যাহা করিয়াছিলেন, সব মাটি। রাম লক্ষ্মণ নাগপাশের বাঁধন ছাড়াইয়া আবার উঠিয়া বসিয়াছে!' রাবণ তাহা শুনিয়া বলিল, 'বল কি? তবেই ত সর্বনাশ!' এই বলিয়া সে রাম লক্ষ্মণকে মারিবার জন্য তাড়াতাড়ি ধূম্রাক্ষকে পাঠাইয়া দিল।

গাধার মুখ সিংহের আর বাঘের মতন হইলে সে জানোয়ার দেখিতে কেমন বিকট হয়? সেই রূপ গাধায় ধূম্রাক্ষের রথ টানিত। সেই রথে চড়িয়া ধূম্রাক্ষ যুদ্ধ করিতে চলিল। সঙ্গে বর্ম আঁটা সিপাহী সৈন্য, হাতি, ঘোড়া, মুষল, মুদগর, পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপালের আর শেস নাই। রাক্ষসদের যেমন গর্জন, তেমনি রাগ! যেন এক একটা ভূত আর কি! পশ্চিম দরজায় হনুমানের পাহারা; রাক্ষসেরা দাঁত কড়মড় করিতে করিতে মার মার শব্দে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রথমে হনুমানের দলের ছোট ছোট বানরদিগের সহিত রাক্ষসদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসদিগের অস্ত্র ধনুক বাণ, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গার প্রবৃতি। বানরদিগের অস্ত্র গাছ আর পাথর। যুদ্ধের সময় বানর আগে নিজের নামটি বলে, তাপর 'জয়রাম' শব্দে গাছ পাথর উঠাইয়া ধাঁই করিয়া রাক্ষসের মাথা ফাটায়। কেহ বা কিল চড় মারিয়া তাহাদের ছাতি ভাঙিয়া দেয়, নখে আঁচড়াইয়া নাক, কান ছিঁড়িয়া আনে! এইরূপে মার খাইয়া রাক্ষসেরা কিছুতেই বানরদিগের সামনে টিকিতে পারিল না।

তাহা দেখিয়া ধূম্রাক্ষ এমনি তেজের সহিত বানরদিগকে তাড়া কারিল যে, তাহারা পলাইবার পথ পায় না। যাহা হউক, হনুমানের সামনে এত বাহাদুরি আর কতক্ষণ থাকে? হনুমান তাহাকে এমনি এক পর্বতের চূড়া ছুঁড়িয়া মারিল যে, তাহাতে তাহার রথখানি একেবারে চুরমার হইয়া গেল। ইহার আগেই সে গদা হাতে করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, তাই রক্ষা; নহিলে তাহাকেও রথের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইত। ততক্ষণে হনুমান গাছ দিয়া অন্যান্য রাক্ষসগুলিকে শেষ করিয়া দিয়াছে। কেবল গদা হাতে ধূম্রাক্ষই বাকি। সেটা বড়ই ভয়ঙ্কর গদা; তাহার গায় বড় বড় কাঁটা! কিন্তু ভয়ঙ্কর হইলেও তাহা দিয়া সে হনুমানের কিছু করিতে পারিল না। বরং হনুমানই পর্বতের চূড়া দিয়া তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিল। ধূম্রাক্ষের পরে যে যুদ্ধ করিতে আসিল, তাহার নাম বজ্রদংষ্ট্র। বজ্রদংষ্ট্র অনেক যুদ্ধ করিয়া, শেষে অঙ্গদের হাতে মারা গেল।

বড় বড় রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিতে আসে আর বানরেরা তাহাদিগকে মারিয়া শেষ করে। এইরূপে অকম্পন যুদ্ধে আসিয়া হনুমানের হাতে, নরান্তক দ্বিবিদের হাতে, কুম্ভ হনু জাম্ববানের হাতে আর প্রহস্ত নীলের হাতে প্রাণ দিল। রাক্ষস মারিয়া বানরদিগের আনন্দের সীমা নাই। আর যুদ্ধে যাহারা জয়লাভ করিল, তাহাদের প্রশংসার শেষ নাই।

এদিকে লঙ্কায় আবার যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল, আর দেখিতে দেখিতে আবার অসংখ্য রাক্ষস যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। এ রাক্ষস দেখিয়া রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা বিভীষণ, এত সৈন্য এত অস্ত্র লইয়া কে আসিল?'

বিভীষণ বলিল, 'ঐ যাহার রথের নিশানে সিংহের চেহারা দেখিতেছেন, সে ইন্দ্রজিৎ। আর ঐ যাহার খুব লম্বা চওড়া শরীর, তাহার নাম অতিকায়।

সেও রাবণের পুত্র। ঐ যে হাতির গলায় ঘন্টার শব্দ হইতেছে, তাহার উপরে মহোদর। ঐ যে লাল রঙের যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়িয়া আছে, তাহার নাম পিশাচ। শূল হাতে ষাঁড়ের উপর চড়িয়া যে আসিতেছে, উহার নাম ত্রিশিরা। যাহার নিশানে সাপের ছবি, সে কুম্ভ। আর যাহার হাতে পরিঘ রহিয়াছে, সে নিকুম্ভ। ঐ যাঁহার মাথায় মুকুট আর উপরে সাদা ছাতা, তিনি নিজে রাবণ।'

রাম বলিলেন, 'রাবণ আসিয়াছে? ভালই হইয়াছে! আজ সীতাকে চুরি করিয়া আনিবার শাস্তিটা উহাকে দিতে হইবে।'

রাবণকে দেখিয়া সুগ্রীব একটা পর্বতের চূড়া ছুঁড়িয়া মারিল। রাবণ সেই পর্বত কাটিয়া সুগ্রীবকে এমনই এক বাণ মালি যে তাহাতে সে চিৎকার করিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া জ্যোতিমুখ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ আর নল ছুটিয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু তাহাদের সাধ্য কি যে রাবণের সম্মুখে টিকিয়া থাকে! বাণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বানরেরা একেবারে রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। তখন রাম নিজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, আমি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিব।'

এদিকে হনুমান ছুটিয়া গিয়া রাবণকে বলিল, 'আজ এই এক কিলে তোর প্রাণ বাহির করিয়া দিব!'

রাবণ বলিল, 'মার্ দেখি তোর কত জোর!' এই বলিয়া সে আগেই হনুমানের বুকে এক চড় মারিল। হনুমানের খুব লাগিল বটে, কিন্তু সে সামলাইয়া উঠিয়া রাবণের বুকে এক চড় মারিয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া দিল। আবার রাবণ একটু সুস্থ হইয়া হনুমানের বুকে এমন এক কিল মারিল যে হনুমান সহজে তাহার চোট সামলাইয়া উঠিতে পারিল না।

ততক্ষণে রাবণ হনুমানকে ছাড়িয়া নীলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। রাবণ বাণ মারে আর নীল গাছ পাথর মারে। ইহার মধ্যে নীল হঠাৎ খুব ছোট্টটি হইয়া কখন গিয়া রাবণের রথের নিশানে উঠিয়াছে। সেখান হইতে রাবণের মুকুটে, সেখান হইতে তাহার ধনুকের আগায়। এমনি করিয়া সে তাহাকে কি যে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, তাহা বলিবার নহে। তাহা দেখিয়া বানরেরা যত হাসে, রাবণের রাগ ততই বাড়িয়া যায়। শেষে সে অগ্নিবাণে নীলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া, লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মণ আর রাবণের অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইল। রাবণ বাণ মারে, লক্ষ্মণ তাহা কাটেন ; আবার লক্ষ্মণ বাণ মারেন, রাবণ তাহা কাটে। একবার ব্রহ্মার দেওয়া একটা বাণ মারিয়া রাবণ লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। কিন্তু লক্ষ্মণ তখনই আবার সুস্থ হইয়া রাবণের ধনুক কাটিয়া, তারপর তিন বাণে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ছাড়িলেন।

তারপর রাবণের আবার জ্ঞান হইলে সে একটা শক্তি হাতে লইল। এই শক্তি ও ব্রহ্মা তাহাকে দিয়াছিলেন। ইহা অতি ভয়ানক অস্ত্র! লক্ষ্মণ বাণ মারিয়া তাহা কাটিলেন, তবুও সেটা আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। তখন রাবণ তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সাধ্য কি যে তাঁহাকে নাড়ে! ততক্ষণে হনুমান আসিয়া তাহার বুকে অমনি এক কিল মারিল যে, তেমন কিল আর সে কখনও খায় নাই। কিলের চোটে রাবণ রক্ত বমি করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেল।

এদিকে হনুমান লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া রামের নিকট লইয়া আসিয়াছে। সেখানে তাঁহার বুক হইতে শক্তি খসিয়া পড়িবামাত্রই তিনি সুস্থ শরীরে উঠিয়া বসিলেনা তক্ষণে রাবণও আবার উঠিয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করাতে, রাম নিজেই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান বলিল, 'আমার পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করুন।'

হনুমানের উপর রাবণের আগে হইতেই বিষম রাগ। কাজেই এবার তাহাকে বাগে পাইয়া সে খুব করিয়া বাণ মারিতে ছাড়িল না। কিন্তু খালি হনুমানকে বাণ মারিলে কি হইবে? রামকে আটকাইতে পারিলে তবে ত হয়! তাহার রথ ঘোড়া সারথি সকলই কাটিয়া শেষ করিয়াছেন, এখন তাহার নিজের প্রাণটি লইয়া টানাটানি। ইহারই মধ্যে তাহার মুকুট গিয়াছে, আর সে নিজে এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার আর ধনুক ধরিবারও ক্ষমতা নাই। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, 'তোমার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, তারপর অন্য সময়ে দেখা যাইবে।' তখন রাবণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া লঙ্কার ভিতর চলিয়া গেল।

এখন রাবণ করে কি? সিংহাসনে বসিয়া সে চিন্তা করিতেছে, চারিদিকে রাক্ষসেরা দাঁড়াইয়া। তাহাদের দিকে চাহিয়া রাবণ বলিল, 'এত করিয়া শেষটা

কিনা আমাকে মানুষের কাছে হারিতে হইল। পূর্বে যখন তপস্যা করিতে গেলাম, তখন ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। আমি তখন বলিলাম, "দেবতা, অসুর, রাক্ষস ইহাদের কেউই যেন আমাকে মারিতে না পারে, এই বর দিন। ত ব্রহ্মা সেই বরই দিলেন, তখন আমার মাথায় একবারও মনে হয় নাই মানুষ এত বড় শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। আমি তখন মানুষের কথা বলি নাই। তাই রাম-লক্ষণের কাছে আমি পরাজিত। তোমরা শীগ্রই কুম্ভকর্ণকে জাগাও, সে যদি রাম-লক্ষণকে মারিতে পারে।"

কুম্ভকর্ণ রাবণের ভাই। রাবণের তিন ভাই ছিল। রাবণ বড় তারপর কুম্ভকর্ণ, তারপর বিভীষণ। ইহারা বিশ্রবা মুনির পুত্র। ইহাদের মাতার নাম কৈকসী। বিশ্রবার আর এক পুত্রের নাম কুবের। রাবণ আর কুম্ভকর্ণ জন্মিবার পূর্বেই বিশ্রবা কৈকসীকে বলিয়াছিলেন, "এ দুইটা পুত্র ভয়ংকর রাক্ষস হইবে ।" হইলই তাই। রাবণের চেয়ে কুম্ভকর্ণ যেন আরো একধাপ বেশি ছিল। সে মুনিদিগকে দেখিবামাত্র ধরিয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিত।

একদিন তাহাদের মাতা দুঃখ করিয়া কুবেরকে দেখাইয়া রাবণ কহিলেন, "দেখ ত ইহারা কেমন ভালো। তোমরা এমন হইলে কেন?" রাবণ কহিলেন, "দেখুন মাতা, আমরা ইহাদের চেয়েও ভাল হইতেছি।" তাই বলিয়া রাবণ বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া ভীষণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। দশ হাজার বছর তপস্যা করিবার পর ব্রহ্মা আসিয়া বর প্রার্থণা করিতে বলিলেন।

রাবণ বলিলেন, "এমন বর প্রদান করুন যেন আমার কোনদিন মৃত্যু না হয়।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "এমন বর দেওয়া যাইবে না, অন্য বর প্রার্থন্য কর।" তখন রাবণ বলিলেন, "তাহলে এই বর দিন যেন দেবতা, রাক্ষস, দৈত্য কেউই আমাকে হত্যা না করিতে পারে।"

ব্রহ্মা বলিলেই, "তবে তাই হোক। পাশাপাশি তোমাকে আরো বর প্রদান করিলাম যে, তুমি যখনই ইচ্ছা যেকোন রূপ ধরিতে পারিবে।"

তারপর ব্রহ্মা বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বর চাও?"

বিভীষণ বলিল, 'আমাকে দয়া করিয়া এই বর দিন যে, আমার যেন সকল সময়েই ঈশ্বরেতে আর ধর্মেতে মতি থাকে।'

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে। আর তাহা ছাড়া, তুমি অমর হইবে।' এই বলিয়া তিনি কুম্ভকর্ণকে বর দিতে চাহিলেন।

এমন সময় দেবতারা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'দোহাই ঠাকুর এই হতভাগাকে বর দিবেন না! ইহার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি! এই দুষ্ট ইহারই মধ্যে সাতটা অপ্সরা, ইন্দ্রের দশ জন চাকর আর তাহা ছাড়া বিস্তর মুনি ঋষি খাইয়া ফেলিয়াছে। বর না পাইতেই এমন, বর পাইলে কি আর কাহাকেও রাখিবে?'

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি গিয়া উহার বুদ্ধি নাশ করিয়া দাও।'

ব্রহ্মার কথায় সরস্বতী তখনই কুম্ভকর্ণের মনের ভিতররে গিয়া ঢুকিলেন আর তাহাতেই তাহার মাথায় এমনি গোল লাগিয়া গেল যে, সে আর বুঝিয়া সুঝিয়া ব্রহ্মার সহিত কথা কহিতে পারিল না।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুম্ভকর্ণ, কি বর চাহ?'

কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমি দিনরাত খালি ঘুমাইতে চাহি।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'বেশ কথা, তাহাই হউক।'

কুম্ভকর্ণের কথা অগস্ত্য মুনি এইরূপ বলিয়াছেনকিন্তু তাহার কথা 'বিভীষণ যাহা বলিয়াছে, তাহা অন্য রূপ। বিভীষণ বলে যে, কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত দুষ্ট ছিল বলিয়া ব্রহ্মা নিজেই তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন, 'তুই ছয় মাস ঘুমাইবি আর একদিন জাগিয়া থাকিবি।'

যাহা হউক, সে অবধি কুম্ভকর্ণ কেবলই ঘুমায়। সেই কুম্ভকর্ণকে এখন রাক্ষসেরা জাগাইতে চলিল।

একটা পর্বতের গুহার ভিতরে কুম্ভকর্ণের শুইবার ঘর। ঘরখানি অতি সুন্দর। তাহার মেঝে সোনার আর দেয়ালের কারিকুরি অতি আশ্চর্য। গুহাটি এক যোজন চওড়া আর তাহার দরজাও তেমনি বড়। বড় দরজা না হইলে কুম্ভকর্ণ ঘরে ঢুকিবে কি করিয়া? তাহার শরীর এতই বড় যে, বিছানায় শুইয়া থাকিলেও তাহাকে একটা পর্বতের মতন দেখা যায়। তাহার নাকের নিঃশ্বাসে ঝড় বহে। সেই ঝড়ের চোটে রাক্ষসেরা ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যায়।

প্রথমে অনেক শুয়োর, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি জন্তু আর কলসী কলসী রক্ত আনিয়া কুম্ভকর্ণের কাছে পাহাড়ের মতন করিয়া রাখা হইল। ঘুম হইতে উঠিয়া তাহার বিষম ক্ষুধা হইবে। তখন আর কিছু না পাইলে যাহারা জাগাইতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিয়াই হয়ত মুখে দিবে। কাজেই আহার যোগাড়টি সকলের আগে আর বেশ ভালরকম হওয়া চাই।

তারপর তাহার গায় চন্দন লেপিয়া আর ঘরে ধূপ জ্বালাইয়া রাক্ষসেরা নানারকম শব্দ করিতে লাগিল। বড় বড় শঙ্খ, যাহার একটার আওয়াজ শুনিলে প্রাণ চমকিয়া যায়, তাহার কয়েক শত আনিয়া তাহারা একসঙ্গে বাজাইল। আবার কয়েক শত রাক্ষস মিলিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিল। না জানি তখন ব্যাপারখানা কিরকম হইয়াছিল। রাক্ষসেরা চিৎকার ত সহজ চিৎকার নহে, তাহার কাছে শঙ্খ কোথায় লাগে! সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আবার বাহু চাপড়াইবার ঘোরতর চটাপট শব্দ!

এই সকল বিকট শব্দ তাহারা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে করিয়াছিল। সে কি যেমন তেমন কোলাহল! আকাশের পাখি তাহা শুনিলে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। এমনিতর শব্দ করিয়া তাহারা প্রাণপণে কুম্ভকর্ণের গায় নাড়া দিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম তাহাতে ভাঙিল না।

তারপর দশ হাজার রাক্ষস মিলিয়া তাহাকে প্রাণপণে কিল, গদার বাড়ি আর পথরের গুঁতা মারিয়াও জাগাইতে পারিল না। বরং তাহাতে তাহার আরাম বোধ হওয়ায় সে এমনই নাক ডাকাইতে লাগিল যে, তাহার নিঃশ্বাসের সামনে টিকিয়া থাকাই ভার!

তখন সকলে একসঙ্গে গর্জন করিয়া শঙ্খ, ভেরী ও ঢাকের বাদ্য আর মুগুরের গুঁতা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার উপর আবার অনেক হাতি, ঘোড়া আর উট আনিয়া তাহাকে মাড়াইল। তাহাতেও যখন তাহার ঘুম ভাঙিল না, তখন তাহার চুল ছিঁড়িয়া, কান কামড়াইয়া আর কানের ভিতর জল ঢালিয়া তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। শতঘ্নী আনিয়া তাহাকে মারিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ কিছুতেই জাগিল না।

শেষে তাহারা একেবারে এক হাজার হাতি দিয়া তাহাকে মাড়াইতে আরম্ভ করিল। এইবার কুম্ভকর্ণের বোধ হইল, যেন কেহ অতিশয় আদরে তাহার গা টিপিয়া দিতেছে। তখন সে চক্ষু মেলিয়া বসিয়া হাই তুলিল।

সে হাই তোলা দেখিয়া কি আর কাহারও সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে ভরসা হয়? রাক্ষসেরা তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই শুয়োর ও মহিষের ঢিপি দেখাইয়া দিয়াই, অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া দূরে চলিয়া গেল। কুম্ভকর্ণও মাংসের পর্বত আর রক্তের কলসীসকল সামনে পাইয়া তাহা শেষ করিয়া দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না।

রাক্ষসেরা এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; যখন তাহারা দেখিল যে কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা কমিয়াছে, তখন তাহার কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তখনও সুম্ভকর্ণের চোখে ঘুম রহিয়াছে। সে খানিক রাক্ষসদিগের দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে বোকার মতন তাকাইয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে জাগাইলে কেন! কোন বিপদ হইয়াছে নাকি?'

সেখানে মন্ত্রী যূপাক্ষ ছিল। সে হাত জোড় করিয়া বলিল, 'মানুষ আর বানর আসিয়া লঙ্কার ছাবখার করিয়াছে!' তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বলিল, 'তবে আমি আগে সেই মানুষ আর বানরগুলিকে খাইয়া, তাপর দাদার সঙ্গে দেখা করিব।' রাক্ষসেরা কহিল, 'আগে রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া তারপর যুদ্ধ করিতে গেলেই ভাল হয়।' তখন কুম্ভকর্ণ রাবণের সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

যাইবার সময় তাহার সেই বিশাল শরীর আর বিকট চেহারা দেখিয়া বানরেরা যে কি ভয় পাইয়াছিল, তাহা কি বলিব! তাহাদের কেহ রামের কাছে গিয়া আশ্রয় লইল, কেহ ভয়ে মাটিতে শুইয়া পড়িল। অন্যেরা দুই লাফে কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিক নাই। তখন রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওটা আবার কি হে? এরূপ জন্তু ত আর কখনও দেখি নাই! এটা রাক্ষস, না দৈত্য?'

বিভীষণ বলিল, 'ইনি বিশ্রবা মুনির পুত্র, নাম কুম্ভকর্ণ। ইনি জন্মিয়াই এত জন্তু ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করেন যে ইহার ভয়ে সকলে ইন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। ইন্দ্র তখন কুম্ভকর্ণকে বজ্র দিয়া মারিলেন। কুম্ভকর্ণও ঐরাবতের দাঁত ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহার ঘায় ইন্দ্রকে অজ্ঞান করিয়া দিলেন।'

'কুম্ভকর্ণের অত্যাচার দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি কেবল ঘুমাইবে।" ইহাতে পৃথিবীর লোক খুবই আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু রাবণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "প্রভু, কুম্ভকর্ণ আপনার নাতির পুত্র; তাহাকে কি এমন করিয়া শাস্তি দিতে হয়? ইহার জাগিবার উপায় করিয়া দিন।" তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা, ও ছয় মাস ঘুমাইবে, তারপর একদিন জাগিয়া থাকিবে।" রাবণ আজ বড়ই ভয় পাইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন।'

এই কথা শুনিয়া রাম বানরদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সাবধান হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক।' বানরেরা বড় বড় পর্বতের চূড়া হাতে করিয়া লঙ্কার দরজা আটকাইয়া রহিল।

এদিকে কুম্ভকর্ণ রাবণের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, আমাকে কেন জাগাইয়াছেন? কি করিতে হইবে?'

রাবণ বলিল, 'ভাই, তুমি খালি ঘুমাও, কোন খবর ত রাখ না! ইহার মধ্যে দশরথের পুত্র রাম বানর লইয়া আসিয়া লঙ্কা ছারখার করিয়া দিল। বড় বড় বীরেরা তাহাদের হাতে মারা গিয়াছে। লঙ্কায় কি আর যোদ্ধা আছে! তাই তোমাকে জাগাইয়াছি। তুমি যদি ইহাদিগকে মারিতে পার, তবেই রক্ষা!'

তারপর সকল কথা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বলিল, 'না বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করিয়াছেন, তাহাতেই ত এত বিপদ! লোকে এত করিয়া আপনাকে বুঝাইল, আপনি তাহা শুনিলেনই না। বিভীষণ যাহা বলিয়াছিল, সেরূপ করিলে কি এমন হইত? ' তাহাতে রাবণ রাগিয়া বলিল, 'তোমার এত কথায় কাজ কি? যাহা বলিতেছি, তাহাই কর। জান না, আমি তোমার দাদা? বড় যে উপদেশ দিতে আসিয়াছ!'

তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ কহিল, 'আমি যাহা ভাল মনে করিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। দাদা হইলে কি আর তাহাকে ভাল কথা বলিতে নাই? যাহা হউক, আমি থাকিতে আপনার কিসের ভয়? এখনই আমি এগুলিকে মারিয়া দিতেছি।'

তখন রাবণ যার পর নাই খুশি হইয়া বলিল, 'ভাই, তোমার মত বীর আর কে আছে? তাই ত ইহাদিগকে মারিবার জন্য তোমাকে জাগাইয়াছি। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও! শীঘ্র গিয়া রাম লক্ষ্মণ আর তাহাদের সৈন্যদিগকে খাইয়া আইস।'

তারপর রাবণ নিজ হস্তে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধের পোশাক পরাইয়া দিল। তাহার সঙ্গে কত সৈন্য দিল, তাহার সংখ্যা নাই। যখন কুম্ভকর্ণ গর্জন করিয়া শূল হাতে লঙ্কা হইতে বাহির হইল, তখন বানরেরা ত তাহাকে দেখিয়া 'বাবা গো' বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট! একবার দেখিয়া আর তাহারা দুইবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না।

অঙ্গদ কি সহজে তাহাদিগকে বকিয়া ফিরাইতে পারে! একবার অনেক কষ্টে তাহারা ফিরিয়াছিল, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জন্তুর সামনে টিকিয়া থাকা ত সহজ কাজ নহে! যম পাহাড় সাজিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলে তাহাকেও দুই চারিটা পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে পারে, এমন সাহস হয়ত তাহাদের ছিল। কিন্তু

এ আপদ যে যমের চেয়েও ভয়ঙ্কর! কারণ, এ হতভাগা বানর দেখিলেই মিঠাই মণ্ডার মতন তুলিয়া মুখে দেয়! যম ত তাহা করে না। যাহা হউক, এরূপ ভয় খালি ছোট মর্কটগুলাই পাইল, বড় বানরেরা নহে।

বড়দের মধ্যে দ্বিবিদ পাহাড় ছুঁড়িয়া অনেক রাক্ষস মারিল হনুমানও পর্বতের চূড়া আর গাছ লইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত কম যুদ্ধ করে নাই। কিন্তু কুমম্ভকর্ণের শূলের কাছে তাহার গাছ পাথর কিছুই করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া হনুমান রাগের ভরে একটা প্রকাণ্ড পর্বতের চূড়া দিয়া ঠুকিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া দিল। কুম্ভকর্ণও আবার একটু সুস্থ হইয়া, ৮হনুমানের বুকে এমন এক শক্তির ঘা মারিল যে হনুমান বেদনায় চেঁচাইয়া অস্থির।

ইহার পর ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ, আর গন্ধমাদন এই পাঁচজন মিলিয়া কুম্ভকর্নকে মারিতে গেল। কিন্তু তাহারা কুম্ভকর্ণের কি করিবে! তাহারা প্রাণপণ করিয়া আঁচড়, কামড়, লাথি, কিল, গাছ, পাথর যত মারে, কুম্ভকর্ণের তাহাতে বেশ আরামই বোধ হয়–যেন কেহ তাহার ঘামাচি মারিয়া দিতেছে। তারপর কুম্ভকর্ণ যখন তাহাদিগকে বগলে ফেলিয়া চাপিতে আর ঠুকিতে আরম্ভ করিল, তখন বেচারাদের দুর্দাশার শেষ রহিল না।

হাজার হাজার বানর কুম্ভকর্ণকে একসঙ্গে আক্রমণ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। কুম্ভকর্ণ তাহাদিগকে ধরিয়া অমনি মুখে দেয়। অনেক বানর আবার তাহার মুখের ভিতর ঢুকিয়া নাকের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়াও আসে।

তারপর অঙ্গদ অনেক যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। একবার সে বুকে চড় মারিয়া কুম্ভকর্ণকে অজ্ঞান করিয়াছিল বটে, কিন্তু কুম্ভকর্ণও তখনই আবার লাফাইয়া উঠিয়া, এক কিলে অঙ্গদকে অজ্ঞান কলিয়া দিল।

অঙ্গদকে অজ্ঞান দেখিয়া সুগ্রীব পাহাড় হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পাহাড় যে কুম্ভকর্ণের গায় লাগিয়া গুঁড়া হইয়া গেল, তাহা বোধহয় বলিবার আগেই বুঝিয়াছ। তারপর শূল দিয়া সে সুগ্রীবকে এমনি এক ঘা মারিবার যোগাড় করিয়াছিল যে হনুমান তাড়াতাড়ি শূলটা ভাঙিয়া না ফেলিলে, হয়ত তখনই সুগ্রীবের বুক ফুটা হইয়া যাইত। শূল ভাঙার পরেও কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে সহজে ছাড়িল না। সে তাহাকে পর্বতের চূড়ার ঘায় অজ্ঞান করিয়া, রাক্ষসদিগকে দেখাইবার জন্য লঙ্কার ভিতরে লইয়া গেল।

লঙ্কার ভিতরে গিয়াই সুগ্রীবের জ্ঞান হইয়াছে। তখন সে মনে করিল যে, এইবেলা কুম্ভকর্ণকে জব্দ করিবার একটা উপায় করা চাই। যেই এই কথা মনে

করা, আর অমনি দুই হাতে রাক্ষসের দুটি কান, দাঁতে তাহার নাকটি, আর দুই পায়ে তাহার দুই পাশের চামড়া একেবারে শিকড়-সুদ্ধ ছিঁড়িয়া তোলা। সে সময়ে কুম্ভকর্ণ কিরূপ চমকিয়া গিয়াছিল আর কেমন মুখ সিটকাইয়া ফেলিয়াছিল, আর কি ভয়ানক চ্যাঁচাইয়াছিল, আর সুগ্রীবকেই বা কতখানি ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি আছড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা আর বলিবার দরকার নাই। আর সেই গোলমালে যে সুগ্রীবই দুই লাফে সেখান হইতে চলিয়া আসিল, তাহাও সহজেই বুঝিতে পার।

কুম্ভকর্ণের চেহারা একেই ত অতিশয় ভয়ানক, তাহার উপরে আবার এখন নাক কান নাই; সুতরাং তাহা আরও ভয়ানক হইবার কথা। আবার বেদনায় সে এতই রাগিয়া গিয়াছে যে, এখন আর রাক্ষস বানর বুঝিতে পারে না। রাক্ষসকেও ধরিয়া মুখে দেয়, বানরকেও ধরিয়া মুকে দেয়। কাজেই এবারে যে বানরেরা তাহাকে দেখিয়া আরও ভয় পাইল, ইহা আশ্চর্য নহে। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে বলিল, 'লক্ষ্মণ, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি যে সাহস করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আমি এখন রামকে মারিতে আসিয়াছি, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।' এই বলিয়া সে রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

রামের বাণে তাহার হাতের গদা মাটিতে পড়িয়া যাইতে অধিক সময় লাগিল না। তখন আর তাহার অন্য অস্ত্র নাই। কাজেই সে পর্বতের চূড়া লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে বড় বড় বানরেরা দল বাঁধিয়া তাহার ঘাড়ে গিয়া উঠিয়াছে। সে যুদ্ধ করিবে, না বানরগুলিকেই ঝাড়িয়া ফেলিবে, বুঝিতে পারিতেছে না।

কিন্তু রামের বাণ খাইয়াও কুম্ভকর্ণ সহজে কাহিল হইল না। যে বাণে বালি মরিয়াছিল, তাহাও সে সহিয়া রহিল। ইহার মধ্যে কখন সে একটা লোহার মুদগর তুলিয়া লইয়াছে। সেই মুদগর ঘুরাইয়া সে রামের বাণও ফিরাইয়া দিতেছে, আবার বানরদিগকেও মারিতেছে। তাহা দেখিয়া রাম বায়ুবাণে সেই মুদগরসুদ্ধ তাহার হাতটি কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কুম্ভকর্ণ বেদনায় চিৎকার করিতে করিতে, আর এক হাতে একটা তালগাছ লইয়া রামকে মারিতে চলিল। রাম ইন্দ্রঅস্ত্রে সে হাতটাও কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তবুও সে ছুটিয়া আসিতে ছাড়িল না।

তারপর রাম অর্ধচন্দ্র বাণ মারিয়া তাহার পা দুইটা কাটিলেন। তবুও সে গড়াইতে গড়াইতে হাঁ করিয়া রামকে গিলিতে চলিয়াছে। তখন রাম অনেকগুলি বান মারিয়া তাহার মুখের হাঁ বন্ধ করিয়া দিলেন, তারপর ইন্দ্র অস্ত্রে মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের মৃত্যু দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল, আর দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি, ঋষিরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কোলাহলে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিলেন।

রাবণ যখন শুনিল যে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাহার আর দুঃখের মেষ রহিল না। প্রথমে সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞান হইলে পর অনেক কাঁদিয়া মেষে বলিল, হাঁয়, আমি না বুঝিয়া ভাই বিভীষণকে অপমান করিয়াছিলাম, তাহার শাস্তি এখন পাইতেছি! আমার সব গেল! এই বলিয়া সে আবার অজ্ঞান হইয়া গেল।

রাবণের দুঃখ দেখিয়া তাহার পুত্র ত্রিশিরা বলিল, 'মহারাজ আপনি এত দুঃখ করিতেছেন কেন? আমি রাম লক্ষ্মণকে মারিয়া দিতেছি।' তাহা শুনিয়া দেবান্তক, নরান্তক ও অতিকায় নামক রাবণের আর তিন পুত্র এবং মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামে ইহাদের দুই কুড়া বলিল যে, তাহারাও যুদ্ধ করিতে যাইবে।

ইহারা আসিয়া প্রথমে ছোট ছোট বানরদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই অঙ্গদ, হনুমান, নীল আর ঋষভ আসিয়া অতিকায় ছাড়া ইহাদের আর সকলকেই মারিয়া ফেলিল।

অতিকায় তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট একটা রথ, অনেকগুলি অস্ত্র আর এমন একটা বর্ম পাইয়াছিল যে, তাহাতে কিছুই বিঁধিতে পারিত না। সেই বর্মের নাম অক্ষয় কবচ। এই-সকলের জোরে অতিকায় -লক্ষ্মণের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল। লক্ষ্মণ তাহাকে অনেক বাণ মারিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন বাণই সেই বর্ম ভেদ করিতে পারিল না। এমন সময় পবন আসিয়া লক্ষ্মণের কানে কানে বলিলেন, 'ব্রহ্মাস্ত্র মার, অন্য অস্ত্রে এ রাক্ষস মরিবে না। ইহার গায়ে অক্ষয় কবচ আছে।' এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়িলেন। সে অস্ত্র আটকাইবার জন্য অতিকায় কত চেষ্টাই করিল, কত শক্তি, কত গদা, কত শূল ছুড়িয়া মারিল, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত কি তাহাতে থামে! দেখিতে দেখিতে অতিকায়ের মাথা তাহাতে কাটিয়া দুইখন্ড হইয়া গেল।

ইহার পর আবার ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিতে আসিল। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করে। চোরের মত আড়াল হইতে সে সকলকে বাণ মারিল,

অন্যোরা তাহার কিছুই করিতে পারিল না। তাহার বাণ খাইয়া সকল বানর অজ্ঞান হইয়া গেল। রাম লক্ষ্মণ পর্যন্ত অনেকক্ষণ বাণ সহ্য করিয়া, শেষে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ইহাতে রাক্ষসেরা যে খুবই খুশি হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহারা নাচিতে নাচিতে লঙ্কায় গিয়া কহিল, 'এবারে উহাদিগকে মারিয়া আসিয়াছি।'

এদিকে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান সকলেই অজ্ঞান, কেবল বিভীষণ আর হনুমান অজ্ঞান হয় নাই। তাহারা দুইজনে মশাল লইয়া সকলকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই অন্ধকার রাত্রিতে কোটি কোটি বানর যুদ্ধের জায়গায় পড়িয়া আছে ইহাদের ভিতর হইতে কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা কি সহজ কাজ!

অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা এক জায়গায় জাম্ববানকে দেখিতে পাইল। বিভীষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা কলি, 'জাম্ববান, তুমি কি বাঁচিয়া আছ?' তাহা শুনিয়া জাম্ববান অনেক কষ্টে উত্তর করিল, 'চক্ষে তীর লাগিয়াছে, চাহিতে পারি না। আপনার গলার শব্দে বোধ হইতেছে, আপনি বিভীষণ। হনুমান বাঁচিয়া আছে ত?'

বিভীষণ বলিল, 'তুমি রাম লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে না, অন্য কাহারও কথা জিজ্ঞাসা করিলে না, আগেই হনুমানের কথা কেন?'

জাম্ববান বলিল, 'হনুমান যদি বাঁচিয়া থাকে তবে কোন ভয় নাই; আর যদি সে মরিয়া গিয়া থাকে, তবে আর উপায় নাই।'

তখন হনুমান জাম্ববানকে প্রণাম করিল। হনুমানকে চিনিতে পারিয়া জাম্ববান বলিল, বাছা, তুমি ছাড়া এ সময়ে আমাদের আর কেহ নাই। তুমি চেষ্টা করিলে সকলকে বাঁচাইতে পার। হিমালয়ের পরে ঋষভ আর কৈলাস পর্বত। সেই দুই পর্বতের মাঝখানে ঔষধের পর্বতএসকানে বিশল্যকরণী, মৃত্যুসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরনী আর সুন্ধানী, এই চারি রকমের ঔষধ আছে; শীঘ্র গিয়া তাহা লইয়া আইস।'

হনুমান তখনই ঔষধ আনিতে চলিয়া গেল। হিমালয় পর্বত পার হইলে কৈলাস পর্বত, তাহার কাছে ঔষধের পর্বত। এতদূর যাইতে হনুমানের কিছুই বিলম্ব হইল না। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল যে, ঔষুধ খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। ঔষধের গাছ ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে তাহা সে দূর হইতে

দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু কাছে আসিতেই তাহারা যে কোথায় লুকাইয়াছে কিছুই বুঝিবার জো নাই।

তখন হনুমান রাগিয়া বলিল, 'আচ্ছা দাঁড়াও! আমি পাহাড়সুদ্ধই লইয়া যাইতেছি!' এই বলিয়া গাছ, পাথর, হাতি, গণ্ডার সবসুদ্ধ সেই প্রকাণ্ড পাহাড় ধরিয়া সে এমনই বিষম টান দিল যে সেই টানে একেবারে পাহাড়ের গোড়া অবধি চড়্-চড়্ শব্দে উঠিয়া আসিল। তারপর সেটাকে মাথায় কলিয়া ফিরিয়া আসা ত এক মুহূর্তের কাজ!

ঔষধ আনিয়া তাহা আর কাহাকেও খাওয়াইবার দরকার হইল না। সে এমনি আশ্চর্য ঔষধ যে, তাহার গন্ধ পাইয়াই সকলে উঠিয়া বসিল—যেন তাহারা সবে ঘুম হইতে জাগিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ উঠিল। উঠিল না খালি রাক্ষসগুলি। পাছে অনেক রাক্ষস মরিয়াছে দেখিলে বানরদের সাহস বাড়িয়া যায়, এজন্য রাক্ষস মরিলেই অন্য রাক্ষসেরা তাহাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিত। কাজেই ঔষধের গন্ধ তাহাদের নাকে পৌঁছেতে পারিল না আর তাহারাও বাঁচিল না।

সকলে বাঁচিয়া উঠিল, কাজেই ঔষধের কাজ ফুরাইয়া গেল। তখন হনুমান আবার যেখানকার পাহাড়টি, সেইখানে তাহাকে রাখিয়া আসিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় দলে দলে বানর মশাল হাতে লইয়া লঙ্কায় গিয়া ঢুকিল। হনুমান সেবার লঙ্কার সকল স্থান পোড়াইতে পারে নাই, কিন্তু এবার আর কিছু বাকি রহিল না। রাক্ষসেরা বানরদিগের বাধা দিবে কি, তাহারা নিজেরাই তখন পলাইতে ব্যস্ত। তাহাদের সে সময়কার চিৎকার একশত যোজন দূর হইতে শোনা গিয়াছিল।

একদিকে লঙ্কা ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর একদিকে সেই রাত্রিতেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এবারে রাক্ষসদিগের সেনাপতি কুম্ভ, নিকুম্ভ, যুগাক্ষ, শোণিতাক্ষ আর প্রজঙ্ঘ।

সে রাত্রিতে রাক্ষস আর বানরেরা ভয়ানক যুদ্দ করিয়াছিল, কিন্তু বানরদিগের সঙ্গে রাক্ষসেরা আঁটিতে পারিল না। অঙ্গদ, দ্বিবিদ আর মৈন্দ, যুগাক্ষ, প্রজঙ্ঘ আর শোনিতাক্ষের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল।

কুম্ভ দেখিল যে, বানরেরা রাক্ষসদিগকে মারিয়া শেষ করিতেছে। তখন সে ধনুর্বাণ লইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সে সময়ে আর তাহার সামনে কেহ টিকিয়া থাকিতে পারিল না। মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ সকলেই তাহার বাণে

অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহার বাণে চারিদিক এমনি করিয়া ছাইয়া গিয়াছিল যে, জাম্ববান আর সুষেণ আসিয়া বাণের জন্য কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর সুগ্রীব আসিয়া অনেক গাছ, পাথর ছুঁড়িয়া মারিল, কিন্তু তাহাতেও প্রথমে কুম্ভের কিছুই হইল না। তখন সুগ্রীব তাহার ধনুক কাড়িয়া লইল।

ধনুক গেলে কাজেই তখন কুস্তি। কুম্ভ আসিয়া সুগ্রীবকে জড়াইয়া ধরিল। সুগ্রীবও তাহার সহিত খুব একচোট কুস্তি করিয়া শেষে তাহাকে একেবারে সমুদ্রের জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু কুম্ভ তাহাতে হটিবার লোক নহে। সে সেইখান হইতে ভিজা কাপড়ে উঠিয়া আসিয়া সুগ্রীবের বুকে এক কিল মারিয়াছে। সুগ্রীবেরও কাজেই তখন সেই কিলের শোধ দেওয়া দরকার হইল আর সেই শোধ দিতে গিয়া, সুগ্রীবের কিলে কুম্ভের প্রাণও বাহির হইয়া গেল। কাজেই তাহার আর যুদ্ধ করিতে হইল না।

এদিকে ভাইয়ের মৃত্যুতে নিকুম্ভ রাগের জ্বলিয়া একেবারে আগুন্তাহার হাতে একটা ভয়ানক পরিঘ। সেই পরিঘের ভয়ে কেহই তাহার নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেছে না। সেই পরিঘ লইয়া সে হনুমানকে মারিতে আসিল। কিন্তু হনুমান কি পরিঘকে ভয় করিবার লোক? পরিঘকে হনুমান ভয় করা ধূরে থাকুক, বরং সেটাই তাহার বুকে ঠেকিয়া গুঁড়া হইয়া গেল, আর তাহার এক কিলের চোটে নিকুম্ভের বর্ম ছিঁড়িয়া একেবারে খান-খান হইল।

এই সময়ে নিকুম্ভ কোন ফাঁকে তাড়াতাড়ি হনুমানকে ধরিয়া লইয়া এক ছুট দিয়াছিল। কিন্তু হনুমান তাহাতে ঠকিবে কেন? সে প্রচণ্ড এক কিল মারিয়া তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া গেল। তাহার পরেই দেখা গেল যে, সে ঘোরতর গর্জনে নিকুম্ভকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চড়িয়া বসিয়াছে। তখন নিকুম্ভের চিৎকার দেখে কে! যাহা হউক, তাহাকে অধিক চ্যাচাইতে হইল না; কারণ তাহার পরক্ষণেই হনুমান তাহার মাথাটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ইহার পর যে যুদ্ধ করিতে আসিল, সে সেই খরের পুত্র। তাহার নাম মকরাক্ষ। তাহার যুদ্ধের কথা আর কি শুনিবে? রাম তাহাকে হাসিতে হাসিতে যে সকল বাণ মারিলেন, তাহাতেই সে বেচারার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তখন রাবণ আর কাহাকে পাঠাইবে? ইন্দ্রজিৎ ভিন্ন আর লোক নাই। কাজেই ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধ করতে আসিল। তাহার যুদ্ধ কিরূপ, তাহা ত জানাই আছে। সেই চোরা যুদ্ধ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে সে খুবই কষ্ট দিল।

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, 'দাদা, ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া কেন একেবারে সকল রাক্ষস শেষ করিয়া দাও না?' রাম বলিলেন, 'যে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে তাহাকেই মারা যায়; যাহারা যুদ্ধ করিতেছে না, তাহাদিগকে কি মারা উচিত? আচ্ছা, আজ ইন্দ্রজিতের রক্ষা নাই! আজ যদি সে মাটির নীচে গিয়াও লুকায়, তথাপি তাহাকে মারিবই।' এ কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে দেখা গেল যে একটি স্ত্রীলোককে রথে লইয়া ইন্দ্রজিৎ আবার আসিয়াছে। স্ত্রীলোকটি দেখিতে ঠিক সীতার মতন, কিন্তু আসলে তাহা রাক্ষসদের গড়া মায়া, অর্থাৎ জাদুর পুতুল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই মায়া সীতার চুল ধরিয়া ইন্দ্রজিৎ তাহাকে ঘড়গ দিয়া কাটিতে যাইতেছে, আর মায়া সীতা 'হা রাম!' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। তাহা দেখিয়া হনুমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, 'দুষ্ট, সীতাকে যদি মারিস, তবে তোকে এখনই যমের বাড়ি পাঠাইব!' কিন্তু হনুমান এ কথা বলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইবার পূর্বেই, ইন্দ্রজিৎ সে পুতুলটার মাথা কাটিয়া তাহাকে বলিল, 'এই দেখ্ তোদের সীতাকে কাটিয়া ফেলিয়াছি!'

তখন হনুমান রাগে দুঃখে অস্থির হইয়া রাক্ষসদের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু খানিক যুদ্ধ করিয়াই সে ভাবিল, 'সীতা যখন মরিয়া গিয়াছেন, তখন আর কিসের জন্য যুদ্ধ করিব? আগে রামকে গিয়া এই সংবাদ দিই। তারপর তিনি যাহা বলেন, তাহাই করা যাইবে।

ইন্দ্রজিৎ সীতাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এ কথা শুনিয়া রাম দুঃখে নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন কি, সে সময়ে তাঁহাকে শান্ত করাই সম্ভব হইত না, যদি বিভীষণ সেখানে না আসিত।

বিভীষণ সকল কথা শুনিয়া রামকে বলিল, 'সীতাকে কাটিয়াছে, ইহা কখনই হইতে পারে না। যাহা কাটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই মায়া সীতা। তোমরা যথার্থ সীতা মনে করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছ, আর ততক্ষণে সেই দুষ্ট নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিতে গিয়াছে। যজ্ঞ শেষ করিতে পারিলে আর কেহই তাহাকে যুদ্ধের সময় দেখিতে পাইবে না; কাজেই সকলে তাহার নিকটে হারিয়া যাইবে। যজ্ঞ শেষ না হইলে তাহার নিজেকেই মরিতে হইবে। পাছে বানরেরা যজ্ঞে বাধা দেয়, তাই সে এরূপ করিয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই যজ্ঞ শেষ না হইতেই উহাকে মারিতে হইবে। লক্ষ্মণ, আমার সঙ্গে চল। তুমি ভিন্ন

আর কেহ এ কাজ করিতে পারিবে না।' এই বলিয়া লক্ষ্মণকে লইয়া বিভীষণ যজ্ঞ আটকাইতে চলিল।

কিন্তু যজ্ঞ আটকাইতে গেলেই ত আর অমনি তাহা আটকাইয়া ফেলা যায় না। রাক্ষসেরা তাহা সহজে করিতে দিবে কেন? কাজেই সেখানে রাক্ষসদের সহিত লক্ষ্মণের ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যাহা হউক, ইন্দ্রজিতের আর যজ্ঞ করা হইল না। রাক্ষস আর বানরের গর্জনে লঙ্কা কাঁপিতেছে, এই গোলমালের ভিতরে কি আর যজ্ঞ হয়! আর, এখনই গিয়া লক্ষ্মণকে না আটকাইলে ত তিনি মুহূর্তের মধ্যেই সকলকে মারিয়া শেষ করিবেন। কাজেই তখন ইন্দ্রজিৎ ছুটিয়া না আসিয়া আর যায় কোথায়। আর সেইজন্যই যজ্ঞ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতে হইল। প্রাণ বাঁচিলে তবে ত যজ্ঞ হইবে।

এদিকে হনুমান প্রকাণ্ড গাছ লইয়া রাক্ষসদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। রাক্ষসেরাও তাহাকে নানাবিধ অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিতে ছাড়িতেছে না। এমন সময় ইন্দ্রজিৎ আসিয়া হনুমানকে তাড়া করিল। তাহা দেখিয়া বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিল, 'ঐ ইন্দ্রজিৎ আসিতেছে, এই বেলা দুষ্টকে বধ কর।'

তখন লক্ষ্মণ আর ইন্দ্রজিতে কি যুদ্ধই না হইল ইন্দ্রজিৎ রথের উপরে, আর লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠের উপরে। দুইজনেই প্রায় সমান বীর, সুতরাং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমানভাবেই যুদ্ধ চলিল, কাহারও হার জিত নাই। অস্ত্রের ঘায় দুইজনের শরীর দিয়াই দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্রসকল দুইজনেই ছুঁড়িতেছেন, আবার দুইজনেই কাটিতেছেন।

ইহার মধ্যে একবার ইন্দ্রজিতের রথের ঘোড়া আর সারথি কাটা যায়। আবার বাণের অন্ধকারের ভিতরে কখন ছুটিয়া গিয়া, সে আবার নতুন রথে চড়িয়া আসে। তারপর ক্রমাগত দুইবার তাহাকে ধনুক বদলাইতে হইয়াছে। খানিক পরে আবার লক্ষ্মণের ভল্লঅস্ত্রে ইন্দ্রজিতের নতুন রথের সারথি মারা গেল, আর বিভীষণ গদার ঘায় তাহার চারিটা ঘোড়া চুরমার করিয়া দিল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে নামিয়া যেই বিভীষণকে একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, অমনি লক্ষ্মণ তাহা খণ্ড-খন্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে আরও অনেক যুদ্ধে আরও অনেক যুদ্ধের পর শেষে লক্ষ্মণ তাঁহার ধনুকে ইন্দ্রঅস্ত্র জুড়িলেন। ইন্দ্র যাহা দিয়া দৈত্যদিগকে মারিয়াছিলেন, এ সেই অস্ত্র। তাহার চেহারা দেখিয়াই রাক্ষসদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। আর লক্ষ্মণ তাহা ছুঁড়িবামাত্রই ইন্দ্রজিতের মাথা কাটিয়া একেবারে দুইখান হইল।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুত কেবল যে বানরেরাই আনন্দে 'জয় লক্ষ্মণ!' বলিয়া লেজ নাড়িল, তাহা নহে। স্বর্গ হইতে যেমন করিয়া ফুল পড়িল আর দুন্দুভির শব্দ শুনা গেল, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে দেবতারাও ইহাতে কম খুশি হন নাই। দুঃখ হইল খালি রাক্ষসদেরই তাহা ছাড়া আর কে না সুখী হইল?

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাবণ প্রথমে অনেক কাঁদিল। তারপর রাগে অস্থির হইয়া বলিল, 'ইন্দ্রজিৎ মায়া সীতা কাটিয়াছিল, আমি সত্যসত্যই সীতাকে কাটিব!' মন্ত্রীরা বারণ না করিলে, সেদিন সে সীতাকে কাটিয়াই ফেলিত। মন্ত্রীদের কথায় অনেক কষ্টে রাগ থামাইয়া সে বলিল, 'রাক্ষসগণ, আজ তোমরা গিয়া কেবল রামকে ঘিরিয়া মার। তোমাদেরহাতে আজ যদি বাঁচিতেও পারে, তবুও ইহাতে সে দুর্বল হইয়া যাইবে। তাহা হইলে কাল আমি তাহাকে গিয়া মারিব।'

সেই রাক্ষসেরা যখন রামকে মারিতে গেল, তখন রাম এমনই যুদ্ধ করিলেন যে তেমন যুদ্দ কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি কোথায় আছেন তাহাই কেহ বুঝিতে পারিল না, এত তাড়াতাড়ি তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিন ঘন্টার ভিতরে আঠার হাজার হাতি, দুই লক্ষ সৈন্য, দশ হাজার রথ, আর সওয়ারসুদ্ধ চৌদ্দহাজার ঘোড়া তাঁহার বাণে খন্ড-খন্ড হইল। তখন আর আর সকল রাক্ষস ভয়েই পালাইয়া গেল।

এখন আর কে যুদ্ধ করিতে যাইবে? রাবণ ছাড়া লঙ্কায় আর বড় বীর কেহ নাই। কাজেই সে অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে লইয়া নিজেই যুদ্ধ করিতে আসিল। রাক্ষসেরা যত যুদ্ধ জানে, এবারে তাহার কিছুমাত্র ক্রটি করিল না। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! রাবণের সঙ্গে ছোট খাট বীর যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা অল্প সময়ের ভিতরেই মরিয়া গেল।

কিন্তু রাবণ নিজে নিজে এমনি ঘোরতর যুদ্ধ করিল যে বানরেরা তাহার সামনে দাঁড়াইতে পারিল না। যুদ্ধ যাহা হইল, তাহার বেশির ভাগ রাম আর লক্ষ্মণের সঙ্গে লক্ষ্মণ রাবণের ধনুক কাটিলেন আর সারথিকেও মারিলেন। ঘোড়াগুলির জন্য তাঁহার কিছু করিতে হইল না, কারণ বিভীষণ আগেই তাহাদের কর্ম শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার জন্য রাবণ বিভীষণকে শক্তি ছুঁড়িয়া মারে, কিন্তু লক্ষ্মণ তাহা কাটিয়া ফেলাতে বিভীষণের তাহাতে কিছু হয় নাই।

তখন রাবণ আর একটা শক্তি লইল। সেটা এত ভয়ানক যে, তাহার বিতর হইতে ঝক্‌ঝক্ করিয়া আলো বাহির হইতেছে। লক্ষ্মণ দেখিলেন,

ভিভীষণের এবার বড়ই বিপদ। কাজেই তিনি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য রাবণকে খুব বেশি করিয়া বাণ মারিতে লাগিলেন।

তখন রাবণ কহিল, 'বটে! বিভীষণকে বাঁচাইতে চাহিস? আচ্ছা, তবে তোকেই ইহা দিয়া মারিব!' এই বলিয়া সে সেই শক্তি লক্ষ্মণের দিকেই ছুঁড়িয়া মালি। সে অস্ত্র গর্জন করিতে করিতে আসিয়া বুকে বিঁধিবামাত্র লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বুক হইতে তাহা বাহির করিবার জন্য বানরেরা তখনই ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু রাবণ বান মারিয়া তাহাদিগকে তাহার কাছে আসিতে দিল না। তাহা দেখিয়া রাম নিজেই আসিয়া দুই হাতে সেই শক্তি টানিয়া তুলিলেন। রাবণ তাহার যতদূর সাধ্য তাঁহাকে বাণ মারিল, তিনি তাহা গ্রাহ্যও করিলেন না।

লক্ষ্মণের দুঃখে রামের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে দুঃখের দিঁকে তখন মন না দিয়া তিনি বলিলেন, 'লক্ষ্মণ এখন এইভাবেই থাকুন। আগে আমি এই দুষ্টকে শাস্তি দিতেছি।' এই বলিয়া তিনি রাবণকে বাণে বাণে এমনই জব্দ করিয়া তুলিলেন যে, তাহার তখন লঙ্কায় পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন আর বাঁচিবার উপায় রহিল না।

রাবণ পলাইয়া গেলে পর রাম লক্ষ্মণকে লইয়া কাঁদিয়া লাগিলেন। তখন সুষেণ তাঁহাকে বলিল, 'আপনি শান্ত হউন। লক্ষ্মণ মরেন নাই। এখনও তাঁহার বুকের কাছে ধুক্ ধুক্ করিতেছে আর চক্ষু উজ্জ্বল রহিয়াছে। এই রূপে রামকে শান্ত করিয়া সুষেণ তখনই হনুমানেকে দিয়া ঔষধ আনাইল। সে ঔষধের গন্ধে লক্ষ্মণ আবার ভাল হইয়া উঠিলেন।

এদিকে রাবণ আবার আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রামের সহিত তাহার ভয়ানক যুদ্ধ চলিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল যে মণি মুক্তার কাজ করা একখানি উজ্জ্বল রথ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেছে। সেই রথেরে ঘোড়া ছয়টি সবুজ রঙের। তাহাদের শরীরে সোনার অলঙ্কার আর গলায় মুক্তার মালা। সেই রথের সারথি মাতলি হাত জোড় করিয়া রামকে বলিল, 'ইন্দ্র আপনার জন্য এই রথ, ধনুক, কবচ আর অস্ত্র পাঠাইয়াছেন। এই রথে চড়িয়া আপনি রাবণকে বধ করুন। তাহা শুনিয়া রাম সেই রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সে যুদ্ধ যে কি ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা কি বলিব! রাবণ একবার ইন্দ্রের রথের নিশান আর ঘোড়া কাটিয়া বাণে বাণে রামকে অস্থির করিয়া তুলিল। আবার তারপরেই রামের তেজ দেখিয়া তাহার মনে হইল, বুঝি এইবারেই

তাহার প্রাণ যায়। সে সময়ে দেবতা, অসুর প্রভৃতি সকলে রাম রাবণের যুদ্ধ দেখিবার জন্য আকাশে উপস্থিত। অসুরেরা বলে, রাবণের জয় হউক।' দেবতারা বলে, রামের জয় হউক!'

এদিকে রাবণ আগুনের মত তেজাল তিনমুখো একটা শূল ছুঁড়িয়া রামকে বলিল, 'এইবার তুই মরিবি!' কিন্তু রাম আর এক শূলে সেই শূল কাটিয়া, তারপর হাজার হাজার বাণে তাহাকে এমনি নাকাল করিয়া ফেলিলেন যে, সে আর ধনুকখানিও ধরিয়া থাকিতে পারে না। তখন রাম দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, আর তাহার সারথি রথ ফিরাইয়া লঙ্কায় পলাইয়া গেল।

লঙ্কায় আসিয়া একটু সুস্থ হওয়ামাত্রই রাবণ সারথিকে গালি দিতে আরম্ভ করিল, 'ওরে নির্বোধ, তুই কি ভাবিয়াছিস, আমার গায়ে জোর নাই? না কি আমার সাহস কম? দেখ্ ত হতভাগা, কি করিলি? রথ লইয়া পলাইয়া আসিলি, এখন লোকে আমাকে বলিবে কি?'

সারথি বলিল, 'মহারাজ, আপনার পরিশ্রম হইয়াচে আর ঘোড়াগুলিও বড় কাহিল। তাই একটু বিশ্রামের জন্য এইখানে আসিয়াছি। এখন যেমন অনুমতি করেন, তাহাই করি।' এ কথায় রাবণ খুশি হইয়া সারথিকে হাতের বালা পুরস্কার দিয়া বলিল, 'শীঘ্র যুদ্ধের জায়গায় চল্! শত্রুকে না মারিয়া আমি ঘরে ফিরিব না। কাজেই সারথি আবার যুদ্ধের জায়গায় রথ ফিরাইয়া আনিল।

এবারে যে যুদ্ধহইল, তাহাই শেষ যুদ্ধ। কিন্তু রাবণ সহজে মরে নাই। মাথা কাটিলেও যে মরিতে চাহে না, তাহাকে মারা সহজ কি করিয়া হইবে? এক-একবার রাবণের মাথা কাটা যায়, আবার তখনই তাহার জায়গায় আর একটা মাথা উঠে। এইরূপ করিয়া রাম একশত বার তাহার মাথা উঠে। এইরূপ করিয়া রাম একশত বার তাহার মাথা কাটিলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইল না।

তখন মাতলি রামকে বলিল, 'আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ুন নিশ্চয় রাবণ মরিবে।' এই অস্ত্র রাম অগস্ত্য মুনির কাছে পাইয়াছিলেন। ইহার সমান অস্ত্র আর জগতে নাই।

সে অস্ত্র ধনুকে জুড়িবার সময় পৃথিবী অবধি কাঁপিতে লাগিল, জীবজন্তুরা ত ভয় পাইতেই পারে। সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্রই তাহা রাবণের বুকে ভেদ করিয়া মাটির ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এবার রাবণের মৃত্যু আটকায় কাহার সাধ্য! মাথা কাটা গেলেও তাহার মাথা জোড়া লাগিয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রের ঘা খাইয়া আর তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল না। যে রাবণের তেজে দেবতারা

পর্যন্ত অস্থির, সেই রাবণকে মুহূর্তের মধ্যে বধ করিয়া রামের অস্ত্র তাঁহার তূণে ফিরিয়া আসিল।

রাবণের মৃত্যুতে সকলে কিরূপ সুখী হইল, বানরেরা কিরূপ লাফালাফি করিল আর লেজ নাড়িল, দেবতারাই বা কেমন করিয়া দুন্দুভি বাজাইলেন আর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, সে সকল আর বেশি করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যে একটা আনন্দের ঘটনা হইয়াছিল, তাহা সহজেই মনে করিয়া লইতে পারি।

অবশ্য রাক্ষসেরা রাবণের জন্য অনেক দুঃখ করিয়াছিল। যে বিভীষণ তাহার নিকট অপমান পাইয়া এত রাগের ভরে চলিয়া আসিয়াছিল, সে বিভীবণও কি কাঁদে নাই? বিভীষণই সকলের আগে কাঁদিয়াছিল। হাজার হউক, ভাই ত! রাগ যতই থাকু, রাবণের মৃত্যুতে তাহা ভুলিয়া গিয়া সে কাঁদিয়া অস্থির হইল। রাম তাহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

আহা! লঙ্কার রানীরা তখন কি কাতর হইয়াই কাঁদিয়াছিল! সে কান্না শুনিয়া বুঝি পাথরও গলিয়া যায়। তাহাদের ত আর কোন দোষ ছির না, কাজেই তাহাদের দুঃখে কাহার না দুঃখ হইবে? তাহাদিগকে শান্ত করিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। শেসে তাহারা নিজেরাই একে অন্যকে বুঝাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাম বিভীষণকে বলিলেন, 'ইহাদের দুঃখ আমি আর সহিত পারিতেছি না। শীঘ্র রাবণকে পোড়াইবার আয়োজন কর।'

তখন সকলে মিলিয়া রাবণকে রেশমী পোশাকে সাজাইয়া, সোনার পাল্কিতে করিয়া, শ্মাশানে লইয়া গেল। সেখানে চন্দনকাঠের চিতায় অনেক জাঁকজমকের সহিত তাহাকে পোড়ানো হইল। তারপর রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিলেন।

এখন আবার সীতার কথা বলিবার সময় হইয়াছে। দুঃখিনী সীতা এখনও সেই ময়লা কাপড়খানি পরিয়া, বিনা স্নানে, এলো, চুলে, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে অশোক বনে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার দুঃখের সময় কখন পূরাইয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। এমন সময় হনুমান আসিয়া প্রনাম করিয়া তাঁহাকে রাবণের মৃত্যুসংবাদ দিল।

সুখ বা দুঃখ বেশি হইলে লোকে ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সেই সুখ বা দুঃখ যদি নিতান্তই বেশি রকমের হয়, তবে প্রায়ই ব্যস্ত হইবার অবসর থাকে না। তখন লোকে কেমন হতবুদ্ধির মত হইয়া যায়। হনুমানের কথা শুনিয়া সীতাও অনেকক্ষণ সেই রূপ হইয়া রহিলেন। তারপর একটু সুস্থ হইয়া

হনুমানকে বলিলেন, 'বাছা, যে সংবাদ তুমি দিরে, আমি দীন দুঃখিনী তাহার উপযুক্ত পুরস্কার কি দিব?'

কিন্তু হনুমান পুরস্কারের দার ধারে না। সীতা যে সুখী হইয়াছেন ইহাই তাহার পক্ষে ঢের, সে আর কিছু চাহে না। তবে, একটা কাজ করিতে পারিলে তাহার মনটা আরও খুশি হইত। দুষ্ট রাক্ষসীরা সীতাকে কিরূপ কষ্ট দিত, তাহা সে নিজের চক্ষে দেখিয়াছে। সেই রাক্ষসীগুলির ঘাড় ভাঙিতে হনুমানের বড়ই ইচ্ছা ছিল। সীতার অনুমতি পাইলে সে ইহাদের কি দশা করিত, তাহা সেই জানে!

কিন্তু সীতার প্রাণে এতই দয়া যে, যাহারা তাঁহাকে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহাদিগকেও কোনরূপ কষ্ট দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তাই তিনি হনুমানকে বলিলেন, 'বাছা, এমন কাজ করিও না! উহারা গরিব লোক, যাহা করিয়াছেন রাবণের হুকুমেই করিয়াছে। আসলে উহাদের কোন দোষ নাই।'

তারপর সীতা রামের নিকট আসিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যেরূপ আছেন ঠিক সেই রূপ মলিন বেশেই তিনি রামের কাছে আসেন। কিন্তু সকলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, সুন্দর কাপড় আর অলঙ্কার পরাইয়া দিল। এতদিন পরে রামকে দেখিয়া তাঁহার মনে না জানি কতই সুখ হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে সুখ তাঁহার অধিকরক্ষণ রহিল না।

সীতা আসিলে রাম তাঁহাকে বলিলেন, 'সীতা, তুমি রাক্ষসদিগের সঙ্গে এতদিন ছিলে। এখন তুমি আমাদিগকে আগেকার মতন ভালবাস কি না, তাহা কি করিয়া বলিব? আমি রাবণকে মারিয়া তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছি। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে চলিয়া যাও।'

সীতা কত দুঃখই সহিয়াছেন, কিন্তু রামের এই কথায় তাঁহার মনে যে দুঃখহইল, সে দুঃখ আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'হায় হায়, আমার আর বাঁচিয়া কি কাজ? লক্ষ্মণ, আগুন জ্বালিয়া দাও, আমি তাহাতে জ্বালিয়া দিলেন, আর সেই আগুনে সীতা ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

আহা! সংসারের সকল সুখ দিলেও যে সীতার গুণের পুরস্কার হয় না, যাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য এত জনের প্রাণ দিতে হইল, সেই সীতার কিনা শেষে এই দশা!

কিন্তু কি আশ্চর্য! আগুনে সীতার গুণের পুরস্কার হয় না, যাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য এত জনের প্রাণ দিতে হইল, সেই সীতার কিনা শেষে এই দশা!

কিন্তু কি আশ্চর্য! আগুনে সীতার মাথার একগাছি চুলও পুড়িল না। সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে নিজে দেবতা অগ্নি সীতাকে কোলে করিয়া,

চিতা হইতে উঠিয়া আসিতেছেন। সীতা দেখিতে সকালবেলার সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁহার পরনে লাল কাপড়, গায় অলঙ্কার, গলায় মালা। অগ্নি সীতাকে রামের কাছে দিয়া বলিলেন, 'সীতার কোন দোষ নাই।' তখন রাম মনের সুখে পরম আদরের সহিত সীতাকে লইলেন।

এদিকে রাম সীতাকে দেখিবার জন্য দেবতারা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দশরথও আসিয়াছেন। দশরথকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রণাম করিলেন। দশরথ রামকে আদর করিয়া বলিলেন, 'বাছা, স্বর্গে বড় সুখে আছি, কেবল কৈকেয়ীর সেই কথাগুলি মনে হইলে আজও খুব কষ্ট হয়। আজ তোমাদিগকে দেখিয়া আমার সে কষ্ট দূর হইল। আমার জন্য তুমি এতদিন বনে থাকিলে, আর রাবণকে মারিয়া দেবতাদের উপকার করিলে। এখন দেশে গিয়া সুখে রাজত্ব কর।'

রাম হাতজোড় করিয়া দশরথকে বলিলেন, 'বাবা, মা কৈকেয়ী আর ভাই ভরতের উপর আপনার যদি রাগ থাকে, তবে তাহা দূর করুন।' রামের এই কথায় দশরথ সম্মত হইয়া, রাম সীতা আর লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

দশরথ চলিয়া গেলে পর ইন্দ্র রামকে বলিলেন, 'রাম, আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর লও।'

রাম বলিলেন, 'তবে আমাকে এই বর দিন যে, আমার উপকার করিতে আসিয়া যে সকল বানর মরিয়াছে, তাহারা আবার বাঁচিয়া উঠুক। আর তাহাদের দেশের গাছে অনেক ফল আর নদীতে অনেক জল হউক।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হইবে।' এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, যত বানর যুদ্ধে মরিয়াছির সকলে আবার উঠিয়া বসিল—যেন এইমাত্র তাহাদের ঘুম ভাড়িয়াছে।

তারপর দেবতারা রাম লক্ষ্মণকে আদর করিয়া বলিলেন, 'এখন তোমরা মনের সুখে অযোধ্যায় চলিয়া যাও। সেখানে সকলেই তোমাদের জন্য দুঃখিত রহিয়াছে। আর সীতাও অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, তাঁহাকে শান্ত কর।' এই বলিয়া দেবতারা আবার স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছিল; কাজেই রাম সকলকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। সে রাত্রি সকলের কি সুখেই কাটিল। এমন সুখের রাত্রি খুব কমই হইয়া থাকে।

রাবণ মরিল, বনবাসেরও দিন ফুরাইয়া আসিল। এখন অযোধ্যায় ফিরিবার সময়আহা দেখিয়া বিভীষণ রামকে বলির, 'আমার ভাই রাবণ কুবেরের পুষ্পক রথখানি কাড়িয়া আনেন। এখন সেই রথ আপনারই। এই রথে এক দিনেই অযোধ্যায় যাইতে পারিবেন। কিন্তু আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আর একটি দিন আমার এখানে থাকিয়া যাউন।

রাম বলিলেন, 'বন্ধু বিভীষণ, তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ। কিন্তু ভাই, ভরত, মা কৌশল্যা, সুমিত্রা আর কৈকেয়ী প্রভৃতিকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তুমি দুঃখ করিও না। আমি আর একদিও থাকিতে পারিতেছি না, আমাকে এখনই বিদায় দাও।' তখন সারথি পুষ্পক রথ সাজাইয়া আনিল। রাম সীতা আর লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে উঠিয়া, বিভীষণ, সুগ্রীব আর অন্যান্য বানরদিগের নিকট বিদায় চাহিলেন।

তাহারা সকলে হাতজোড় করিয়া বলিল, 'দয়া করিয়া আমাদিগকে আপনার সঙ্গে লউন। আমরা অযোধ্যায় গিয়া আপনার অভিষেক দেখিব, আর মা কৌশল্যাকে প্রণাম করিব।' এই কথায় রাম যার পর নাই সুখী হইয়া বলিলেন, 'তবে তোমরা শীঘ্র রথে উঠ।'

তাহারাও রথে উঠিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। সুগ্রীব উঠিল, বিভীষণ সপরিবারে উঠিল, অন্যান্য বানরেরা সকলে উঠিল—তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাহাদের সকলকে লইয়া সেই হাঁসে টানা পুষ্পক রথ শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে উড়িয়া চলিল।

রথ কিষ্কিন্ধ্যায় আসিলে পর সীতা রামকে বলিলেন, 'আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে যে বানরদিগের বাড়ির মেয়েদিগকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যায় লইয়া যাই।' সুতরাং কিষ্কিন্ধ্যার মেয়েরাও অনেকে পুষ্পক রথে উঠিয়া তাঁহাদের সঙ্গে অযোধ্যায় চলিল।

এইরূপে ক্রমে তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে রামের বনে থাকা চৌদ্দ বৎসরও ফুরাইল।

রামকে দেখিয়া ভরদ্বাজ বলিলেন, 'বাছা, যাইবার সময় তোমাকে দেখিয়া আমার মনে যেমন ক্লেশ হইয়াছিল, আজ তোমাকে আবার দেখিয়া আমার মনে তেমনই আনন্দ হইতেছে। তুমি বর লও।' রাম বলিলেন, 'এই বর দিন যে, অযোধ্যার পথে সকল গাছে যেন মিষ্ট ফল আর মধু পাওয়া যায়।'

মুনির বরে তখনই অযোধ্যার পথের গাছসকল মিষ্ট ফলের আর মধুতে ভরিয়া গেল। বানরেরা কত খাইবে!

তারপর হনুমানকে ডাকিয়া রাম বলিলেন, 'হনুমান, তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় যাও। সেখানে আমাদের সংবাদ দিবে আর সেখানকার সংবাদও লইয়া আসিবে। পথে শৃঙ্গবের নগরের আমার বন্ধু গুহ থাকেন, তাহাকে আমার কথা বলিও। তিনি তোমাকে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন।'

হনুমান তখনই মানুষের বেশ ধরিয়া শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে চলিল। পথে গুহের দেশ। সেখানে রামের সংবাদ দিয়া ভরতের নিকট পৌঁছিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না।

ভরত তখন নন্দীগ্রামে ছিলেন। অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে হনুমান তাঁহার দেখা পাইল। তাঁহারও তপস্বীর বেশ, মাথায় জটা আর পরিধানে গাছের ছাল। ফল-মূল খাইয়া থাকেন আর রামের খড়ম দুইখানিকে সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যের কাজ করেন।

হনুমান তাঁহার কাছে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আপনারা যে রামের জন্য এত দুঃখ করিতেছেন, সেই রাম আপনাদের সংবাদ লইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আর দুঃখ করিবেন না, শীঘ্রই তিনি সকলকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইবেন।'

এই কথা শুনিয়াই ভরত আনন্দে অজ্ঞান হইয়া গেছেন। সুস্থ হইলে পর তিনি হনুমানকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'তুমি দেবতা না মানুষ, দয়া করিয়া আমার এখানে আসিয়াছ? আজ তুমি যে সংবাদ আমাকে শুনাইলে, তাহার পুরস্কার আমি তোমাকে কি দিব? তুমি এক লক্ষ গরু আর একশতখানি গ্রাম লও!'

তারপর হনুমান কুশাসনে বসিয়া রামের সকল সংবাদ ভরতকে শুনাইয়া শেষে বলিল, 'তিনি একন ভরদ্বাজের আশ্রমে আছেন। কাল এইখানে আসিবেন।'

আজ যদি পৃথিবীতে সুখী কেহ থাকে, তবে সে এই অযোধ্যার লোক। সুখী কেন হইবে না? চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া রামের দুঃখে তাহারা চক্ষের জল ফেলিয়াছে, ভার করিয়া খায় নাই, ভাল কাপড় পরে নাই, সেই রাম এত দিনে দেশে ফিরিতেছেন। তাই আজ সকলে পথঘাট পরিষ্কার করিরা, বাড়ি ঘর সাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, বাজনা বাজাইয়া রামকে দেখিতে চলিল। পাল্কি চড়িয়া রাণীরা চলিলেন, ব্রাহ্মণ প্রবৃতিকে সঙ্গে লইয়া ভরত চলিলেন-তাঁহার মাথায় রামের সেই খড়মজোড়া।

যেই রামের রথ দেখা গেল, অমনি সকলে 'ঐ রাম! ঐ রাম!' শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দিল।

তখন যে সকলের মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর, সকলেই তখন যে রামকে প্রাণ ভরিয়া আদর করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য নহে। যাহারা তাঁহার চেয়ে ছোট, তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইল। রামও মা কৌশল্যা আর অন্যান্য রানীদিগকে আর বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিলেন।

তারপর ভরত রামের সেই খড়মজোড়া তাঁহার পায়ে পরাইয়া দিয়া বলিলেন,'দাদা, তোমার রাজ্য আমাকে রাখিতে দিয়া গিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি ফিরাইয়া লও। তোমার রাজ্য এখন আগের চেয়ে দশগুণ বড় হইয়াছে।'

তারপর ক্ষুর হাতে ভাল ভাল ওস্তাদ নাপিতেরা আসিয়া রামের চৌদ্দ বছরের জটা চাঁছিয়া পরিষ্কার করিল। শত্রুঘ্ন রাম লক্ষ্মণকে স্নান করাইয়া নিজ হাতে তাঁহাদিগকে সাজাইয়া দিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি আর যত লোক সঙ্গে আসিয়াছিল,কাহারও আদর যত্নের কোন ত্রুটি হইল না। নিজে মা কৌশল্যা যখন বানরের মেয়েদিগকে সাজাইলেন, তখন কিরূপ আদর যত্ন হইল বুঝিতেই পার।

অবশেষে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিরা রাম সীতাকে মানিকের পিঁড়ির উপর বসাইয়া তাঁহাদের অভিষেক করিলেন। সে অভিষেক কি চমৎকার হইয়াছিল, তাহা কি না দেখিলে বুঝিতে পারা যায়? দেবতারা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অন্য কথায় আর কাজ কি?

যত ভাল ভাল তীর্থ আছে, সকল তীর্থের জল দিয়া রামকে স্নান করানো হইল। স্নানের পর রাম রাজবেশে রত্নের পিঁড়িতে সভা আলো করিয়া বসিলেন। তাঁহার মাথায় সেই মনুর সময় অবধি যাহা অযোধ্যার রাজারা মাথায় দিয়া আসিতেছেন, সেই আশ্চর্য মুকুট। দুই পাশে সাদা চামর হাতে সুগ্রীব আর বিভীষণ। পিছনে সাদা ছাতাখানি লইয়া শত্রুঘ্ন। তখন ইন্দ্রের হুকুমে পবন আসিয়া তাঁহার গলায় স্বর্গের সোনার পদ্মের মালা আর আশ্চর্য মোতির হার পরাইয়া দিলেন।

এইরূপ করিয়া দেবতা গন্ধর্বের গান আর আনন্দ-কোলাহলের ভিতরে রাম অযোধ্যার রাজা হইলেন। তেমন রাজা আর কেহ কখনও দেখে নাই। আজও খুব ভাল রাজার কথা বলিতে হইলে লোকে বলে, 'রামের মতন রাজা!'